আখলাক শিষ্টাচার

মুহাম্মাদ আতীক উল্লাহ
মাদরাসাতুল কুরআনিল কারীম
মধ্যবাড্ডা, ঢাকা

মাদরাসাতুল কুরআনিল কারীম

গণশিক্ষা কার্যক্রম সম্পর্কে পরামর্শ বা মতামত জানাতে পারি : 01552-738562

গণশিক্ষা কার্যক্রম-২

আখলাক শিষ্টাচার (প্রস্তুতিমূলক প্রকাশনা)

মুহাম্মাদ আতীক উল্লাহ

প্রকাশক : মাওলানা ওবায়দুল্লাহ আযহারী

প্রকাশকাল : যিলক্বদ ১৪৪৭ হি./ মে ২০২৬ খ্রি.

স্বত্ব : লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশনায় : মাকতাবাতুল আযহার

গণশিক্ষা প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় : মাদরাসাতুল কুরআনিল কারীম

অনলাইন পরিবেশনায় : ওয়াফিলাইফ.কম ও রকমারি.কম

ফোন : 01924076365

মূল্য : ৫০/- টাকা মাত্র

ইহদা

দেশের অগণিত মেয়েশিশুকে। দেশের অগণিত ছেলেশিশুকে। দেশের অগণিত কিশোরকে। দেশের অগণিত কিশোরীকে। আল্লাহ তাআলা সবার জীবনকে সুস্থ, সুন্দর, বর্ণিল, নিরাপদ ও আনন্দময় করে দিন। আল্লাহ তাআলা সবার ইহকাল ও পরকাল সুন্দর করে দিন। আল্লাহ আমাদের 'ভালো কিছু করি' কর্মসূচি কবুল করে নিন। আমিন।

বিসমিল্লাহ

জীবনে এই বিষয়ক প্রথম বই পড়েছিলাম পীর যুলফিকার আহমাদ নকশেবন্দী সাহেবের অবিস্মরণীয় কিতাব 'বা আদব, বা নসীব'। তখন কতইবা বয়েস, বারো বা তেরো? নিজের জমানো টাকায় সেটাই বোধ জীবনের প্রথম উর্দু কিতাব কেনা। আলহামদুলিল্লাহ, কেনার পরপরই কিতাবটা আগাগোড়া পড়েছি। নিয়মিত পড়েছি। বারবার পড়েছি। এই বইটা মুফতি ইলিয়াস ঘুম্মান সাহেবের 'কিতাবে যিন্দেগি'-কে সামনে রেখে প্রস্তুত করা হয়েছে। এটা খসড়া। ধীরে ধীরে আমাদের মতো করে গুছিয়ে তুলব ইন শা আল্লাহ। রাব্বে কারীম আমাদের কাজে ইখলাস দান করুন। বাংলার প্রতিটি শিক্ষার্থির কাছে বইটা পৌঁছানোর তাওফিক দান করুন। বইটা তাদেরকে ভালোভাবে পড়ানোর উপযুক্ত ব্যবস্থা করে দিন। আমীন।

প্রথম অধ্যায়
তহারত ও নাজাফত

হাম্মাম বা ওয়াশরুমের আদব

১. হাম্মামে প্রবেশের আগে এই দোয়া পড়ব,

بِسْمِ اللهِ اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الخُبُثِ وَالخَبَائِثِ

আল্লাহর নামে (হাম্মামে প্রবেশ করছি) হে আল্লাহ, আমি দুষ্ট জ্বিনপরির অনিষ্ট থেকে আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি।

২. হাম্মামে বামপা দিয়ে প্রবেশ করব, হাম্মাম থেকে ডানপা দিয়ে বের হব।

৩. উন্মুক্ত স্থানে প্রয়োজন সারতে বাধ্য হলে, এমন জায়গা বেছে নিব, যেখানে মানুষের দৃষ্টি পড়ে না।

৪. হাজত সারার সময় কেবলার দিকে মুখ বা পিঠ দিয়ে বসব না।

৫. এমনভাবে বসব যাবে পেশাবের ছিটা উড়ে শরীর বা কাপড়ে না পড়ে।

৬. হাজত সারার সময় অতীব প্রয়োজন ছাড়া কথা বলব না।

৭. চলাচলের রাস্তায়, ছায়াদার-ফলদার গাছের নিচে, বসার স্থানে, কবরস্তানে, স্থির পানিতে, কূপে, নদী-নালা-পুকুর পাড়ে হাজত সারতে বসব না।

৮. খাবারের বস্তু, হাড্ডি, কয়লা, কাগজ, নাপাকবস্তু, কাঁচ, লোহা ইত্যাদি দিয়ে ইস্তিঞ্জা (পরিচ্ছন্নতার কাজ) করব না।

৯. বামহাতে ইস্তিঞ্জা (পানি ব্যবহার) করব। হাঁ, বামহাতে ইস্তিঞ্জা সারতে সমস্যা হলে, ডানহাত ব্যবহার করা যাবে।

১০. দাঁড়িয়ে পেশাব করব না। বসে পেশাব করতে সমস্যা হলে বা বসে পেশাব করার ব্যবস্থা না থাকলে, অপারগ অবস্থায় দাঁড়িয়ে পেশাব করা জায়েজ।

১১. হাম্মাম থেকে বের হওয়ার পর (غُفْرَانَكَ) গুফরানাক, হে আল্লাহ আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাই, পড়ব। আরেকটু বড় করেও পড়তে পরি,

غُفْرَانَكَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي

উচ্চারণ: গুফরানাকা, আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আযহাবা ‘আন্নিল আযা ওয়া ‘আফানী

বাংলা অর্থ: "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমার থেকে কষ্ট দূর করেছেন এবং আমাকে সুস্থ রেখেছেন।

১২. ইস্তেঞ্জার পর দুইহাত সাবান দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে নিবো।

ওজুর আদাব

১. সময় হওয়ার আগে আগে ওজু করে সলাতের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবো।

২. কেবলার দিকে মুখ করে বসার চেষ্টা করব।

৩. প্রতিটি অঙ্গ ধোয়ার সময় কালিমায়ে শাহাদাত পড়ার চেষ্টা করব,

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ

উচ্চারণ: আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান রাসূলুল্লাহ।

“আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল।”

৪. ডানঅঙ্গ আগে ধৌত করব।

৫. ওজুর অঙ্গগুলোকে ভালোভাবে মলে মলে ধৌত করব।

৬. আঙ্গুলে আংটি থাকলে, সেটা নাড়িয়ে নিচে পানি পৌঁছানো জরুরি।

৭. ওজুর অঙ্গগুলোকে নির্দিষ্ট পরিমাণের চেয়ে একটু বেশি ধৌত করব।

৮. ভেজা আঙ্গুল কানে প্রবেশ করাব।

৯. গর্দান মাসেহ করব।

১০. ওজুর পর বেঁচে যাওয়া পানি দাঁড়িয়ে পান করে নিব।

১১. ওজুর পর দোয়া পড়ব,

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ

উচ্চারণ: আশহাদু আল-লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকা লাহু, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহ।

আল্লাহুম্মাজ'আলনী মিনাত-তাওয়াবীন, ওয়াজ'আলনী মিনাল-মুতাতাহ্হিরীন।

তরজমা: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনি এক, তার কোনো অংশীদার নেই। এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রাসুল। হে আল্লাহ! আমাকে তওবা কারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন।

১২. ওজুকালে পানির অপচয় করব না।

মিসওয়াকের আদাব

১. নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর করার আগে মিসওয়াক করব,

কুরআন কারীম তিলাওয়াতের আগে। জুমার দিন। দুই ঈদের দিন। মাহফিল-মজলিসে হাজির হওয়ার আগে। বড় কোনো ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত করার আগে। ওজুর সময়। শোয়ার আগে। ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর। দাঁতে হলদে দাগ পড়ে গেলে। মুখে দুর্গন্ধ দেখা দিলে। ঘরে প্রবেশ করার আগে।

২. মিসওয়াক করার আগে সুন্নত আদায় করছি, এই নিয়ত করব।

শুধু মুখের দুর্গন্ধ দূর করার জন্য মিসওয়াকের নিয়ত না করে, মিসওয়াক পরবর্তী পরিচ্ছন্ন মুখ নিয়ে আল্লাহ তাআলার যিকির করা, কুরআন কারীম তিলাওয়াত করা, সলাত আদায় করার নিয়ত করব।

৩. দাঁতের উপরিভাগ, দাঁতের ভেতরের দিক, জিহ্বার উপরিভাগ, উপরের তালু মিসওয়াক করব।

৪. মিসওয়াকের দৈর্ঘ একবিঘত পরিমাণ হওয়া উত্তম। এর বেশি লম্বা না হওয়া ভালো। মিসওয়াক এক আঙুল পরিমাণ মোটা হওয়া ভালো।

৫. যায়তুন, পিলু, নিম গাছের মিসওয়াক ব্যবহার করা ভালো।

৬. ডানহাত দিয়ে মিসওয়াক করব।

৭. ডানদিকের দাঁত আগে মিসওয়াক করব।

৮. মিসওয়াক না থাকলে, ব্রাশ বা আঙুল দিয়ে সাধ্যমতো দাঁত পরিষ্কার করে নিবো।

৯. প্রতিবার তিনদফা মিসওয়াক করার চেষ্টা করব। প্রতিদফায় কুলি করে মুখ পরিষ্কার করে নিবো। তারপর আবার মিসওয়াক করব।

১০. মিসওয়াক মুখে দেয়ার আগে সম্ভব হলে ধুয়ে নিবো, মিসওয়াক শেষ করার পরও ধুয়ে নিবো।

গোসলের আদাব

১. গোসল করার সময় পর্দা-আড়ালের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখব।

২. খোলা জায়গায় লোকচক্ষুর সামনে গোসল করলে, লুঙ্গি-পাজামা ভালো করে বেঁধে রাখব। লুঙ্গি-পাজামা সাদা পাতলা কাপড়ের হলে, উপরে গামছাজাতীয় কিছু পেঁচিয়ে নিবো।

৩. গোসলখানায় বাম পা দিয়ে ঢুকব।

৪. গোসলের আগে বামহাত দিয়ে লজ্জাস্থান ভালোভাবে ধুয়ে নিবো।

শরীরের কোথাও নাপাকি লেগে থাকলে, সেটাও বামহাত দিয়ে পরিষ্কার করব।

৫. গোসলের আগে নামাযের ওজু করে নিতে পারি। তবে, গোসলের সময় ওজুর অঙ্গগুলো বাড়তি যত্নে ধুলে নিলে ওজুর সুন্নত আদায় হয়ে যাবে।

৬. ওজু-গোসলে ব্যবহৃত পানিতে পা ডুবে থাকলে, ওজু-গোসলশেষে সেখান থেকে একটু সরে গিয়ে পা ধুয়ে নিবো। ব্যবহৃত পানিতে পা ডুবে না থাকলে, আলাদা করে পা ধোয়ার দরকার নেই।

৭. প্রথমে মাথায় পানি ঢালব, তারপর ডানকাঁধে, তারপর বামকাঁধে। এমনভাবে পানি ঢালব, যাতে পানি মাথা থেকে পা পযন্ত গড়িয়ে যায়।

৮. পুরো শরীর ভালোভাবে মলে নিবো, যাতে কোথাও শুকনো থেকে না যায়।

৯. শরীরে তিনবার পানি ঢালব। সাবান-শ্যাম্পু ব্যবহার করলে, ভালোকরে শরীর ধুয়ে নিবো।

১০. বস্ত্রবিহীন শরীর নিয়ে কেবলামুখি হবো না।

১১. পানি ব্যবহারে মিতব্যয়ী হবো। প্রয়োজনের চেয়ে কম বা বেশি খরচ করব না।

১২. আংটি, চুড়ি, বালা, কাঁকন ইত্যাদি আঁটসাঁট হয়ে থাকলে, সেগুলো নাড়া দিয়ে নিচে পানি পৌঁছানো আবশ্যক।

১৩. গোসল করাকালে কোনো ধরণের দোয়া-যিকির উচ্চারণ করব না।

১৪. গোসল চলাকালে বিনা প্রয়োজনে কথাবার্তা না বলা উত্তম।

১৫. গোসল চলাকালে সালাম দেয়ানেয়া অনুচিত।

১৬. গোসল সারার পর পাক কাপড় দিয়ে শরীর মুছে নেওয়া উচিত।

১৭. গোসলখানা থেকে ডান পা দিয়ে বের হবো।

১৮. ব্যবহারের পর গোসলখানা পরিষ্কার করে বের হব।
১৯. যৌথ গোসলখানায় সাবানের টুকরা, সাবানের প্যাকেট, শ্যাম্পুর কৌটা, অবাঞ্ছিত চুলপশম, ব্যক্তিগত জামাকাপড় রেখে আসা উচিত নয়।
২০. মলমূত্র ত্যাগ করার পর ভালো করে পানি ঢেলে দুর্গন্ধ দূর করে আসা উচিত।
২১. রেজার, ব্লেড ইত্যাদি আড়ালে রাখা উত্তম। ওয়ানটাইম হলে, সেগুলো উপযুক্ত স্থানে ফেলা উচিত।

মাথার চুলের আদাব

১. মাঝেমধ্যে চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়ানো উচিত।
২. ডান দিক থেকে আঁচড়ানো শুরু করব।
৩. মাথার মাঝ বরাবর সিঁথি করা ভালো।
৪. নিয়মিত পরিমিত পরিমাণে চুলে তেল ব্যবহার করা উত্তম।
৫. আঁচড়ানোর সময় উঠে আসা চুল সসম্মানে মাটির নিচে দাফন করে দেয় উত্তম। মানবশরীর সম্মানযোগ্য। মানুষের চুল বেচাকেনা করা হারাম।
৬. নারীরা পুরুষের মতো, পুরুষরা নারীদের মতো চুল রাখবে না। নারী ও পুরুষ একে অন্যের সাদৃশ্য অবলম্বন করা হারাম।
৭. সাদা চুল না উঠনো উত্তম।
৮. সাদা চুল নিয়ে অস্বস্তি থাকলে, কালো রঙ ছাড়া অন্য যে কোনো রঙের খেজাব মাখানো যেতে পারে।
৯. অমুসলিমদের মতো চুল কাটাব না। চুল কাটানোর সময় কোথাও ছোট, কোথাও বড় রাখব না, পুরো মাথার চুল সমান করে কাটাব।
১০. মাথার টাক ঢাকার জন্য মানুষের চুল দিয়ে তৈরি উইগ ব্যবহার করা নাজায়েজ।

১১. সপ্তমদিন নবজাতকের মাথা মুন্ডন করে চুলের ওজন পরিমাণ রূপা বা সমমূল্য সদকা করে দিব।

দাড়ি-গোফের আদাব

১. দাড়ি বড় করব, গোফ কেটে ফেলব। দাড়ি একমুষ্ঠি পরিমাণ রাখা ওয়াজিব। এর চেয়ে ছোট করা গুনাহ।
২. নিয়মিত চিরুনি দিয়ে দাড়ি বিন্যস্ত রাখা উত্তম।
৩. যত্নের সাথে দাড়ি ধুলে তেল মাখানো উত্তম।
৪. সাদা দাড়ি উঠিয়ে ফেলা অনুচিত।
৫. সাদা দাড়িতে খেজাব লাগানো যেতে পারে। কালো খেজাব ব্যবহার করা না-জায়েজ। অন্য যে কোনো রঙের খেজাব ব্যবহার করা যেতে পারে। মেহেদি লাগানো উত্তম।
৬. আয়না দেখে দাড়ি গুছিয়ে রাখা উত্তম।
৭. বিধর্মীদের মতো ফ্যাশনদুরস্ত দাড়ি নয়, সুন্নত তরিকায় একমুষ্ঠি পরিমাণ দাড়ি রাখব।
৮. লম্বা দাড়িতে গিঁঠ লাগানো উচিত নয়। দাড়িকে ছেড়ে রাখা উত্তম।
৯. নিমদাড়ি, নিচের ঠোঁট সংলগ্ন দাড়ি কাটা উচিত নয়।
১০. নিয়মিত গোফ ছেটে ফেলা উচিত। কোনো অবস্থাতেই গোফ এতবড় হতে দিব না, পানাহারের সময় খাবার বা পানি গোফ ছুঁয়ে যায়।

নখ সম্পর্কিত আদাব

১. প্রতি জুমাবারে নখ কাটার চেষ্টা করব। কোনো কারণে সম্ভব না হলে, পনের দিনের মধ্যে অবশ্যই নখ কেটে ফেলব। কোনো অবস্থাতেই ৪০ দিনের বেশি নখ না কেটে রেখে দেয়া গুনাহ।

২. কর্তিত নখ সম্ভব হলে মাটির নিচে দাফন করে ফেলা উত্তম। যেখানে সেখানে, ময়লার ঝুড়িতে খোলামেলাভাবে কর্তিত নখ ফেলা উচিত নয়। অন্য কোনো উপায় না থাকলে, কিছু একটাতে মুড়িয়ে ফেলা যেতে পারে।
৩. দাঁত দিয়ে নখ কাটা উচিত নয়। ব্লেড বা নেইলকাটার ব্যবহার করা উত্তম।
৪. নখ কাটার কোনো মাসনুন তরিকা হাদীসে বর্ণিত হয়নি। ডানদিক প্রাধান্য দেয়ার সুন্নত অনুসরণ করার নিয়তে, ডানহাতের কনিষ্ঠা থেকে শুরু করে বৃদ্ধাঙ্গুলি হয়ে বামহাতের কনিষ্ঠাতে গিয়ে নখ কাটা শেষ করতে পারি। পায়ের ক্ষেত্রেও একই ব্যবস্থা। কোনো কোনো আলেম এমনও বলেছেন, প্রথম ডানহাতের তর্জনি (শাহাদাত আঙুল **Index finger**) থেকে শুরু করে বামহাতের কনিষ্ঠা হয়ে ডানহাতের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে গিয়ে শেষ হবে।
৫. নিয়মিত নখ পরিষ্কার রাখা জরুরি। নখের নিচে যেন ময়লা জমে না যায়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা জরুরি।
৬. নেইলপালিশ লাগানো কারণে যদি নখে পানি না পৌঁছে, তাহলে ওজু হবে না। এমন নেইলপাশিল লাগালে ওজুর আগে তুলে ফেলতে হবে।

সুরমা মাখার আদাব

১. দিন বা রাত যে কোনো সময় চোখে সুরমা লাগানো যাবে। রাতে সুরমা লাগানো উত্তম। তাহলে সুরমা বেশি সময় চোখে থাকবে।
২. প্রথমে ডানচোখে তারপর বামচোখে সুরমা লাগাব।
৩. উভয়চোখে তিনবার করে সুরমা মাখা উত্তম।
৪. চোখে ইসমিদ সুরমা মাখা উত্তম। ইসমিদ পাওয়া না গেলে, সহজলভ্য যে কোনো সুরমা মাখা যেতে পারে। নবীজি সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসমিদ সুরমা মেখেছেন।

আতর মাখার আদাব

১. সুন্দর সুবাসময় আতর মাখা উচিত।
২. পুরুষ নিজের দাড়ি ও মাথার চুলে আতর মাখাতে পারেন।
৩. নারীরা নিজের ঘরে আতর-সুবাস মাখবেন। কোনো অবস্থাতেই ঘরের বাইরে যাওয়ার সময় সুবাস ব্যবহার করবেন না।
৪. স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে আতর-সুবাস মাখিয়ে দিবেন।
৫. স্ত্রী নিজে উদ্যোগী হয়ে স্বামীকে সুবাস মাখিয়ে দিবেন।
৬. আতর প্রথমে হাতের তালুতে নিয়ে, দুই হাতে আতর ভালোভাবে ঘষে কাপড়ে ও শরীরে মাখা উত্তম।
৭. একসাথে একাধিক আতর হাতের তালুতে মিশিয়ে ব্যবহার করলে সুবাস স্থায়ী হয়।
৮. নিম্নোক্ত সময়ে আতর মাখা উত্তম-

কুরআন তিলাওয়াতকালে। হাদীস শরীফ অধ্যয়নকালে। আল্লাহর যিকির করার সময়। ওজুর পর। জুমার দিন। দুই ঈদের দিন। এহরামের নিয়ত করার সময়। কোনো অনুষ্ঠানে যাওয়ার আগে। সংসারি নারীগণ দিনের কাজকর্ম শেষ করে শোয়ার আগে, মাসিক শেষ হওয়ার পর নামায শুরু করার আগে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
ইবাদত-বন্দেগী

ইবাদত বন্দেগীতে যদি আদাবের প্রতি লক্ষ্য রাখা যায়, তাহলে আমাদের আত্মিক ও আখলাকি স্তর অনেক উঁচুতে উঠে যাবে। আল্লাহ তাআলার মহব্বত, খাশিয়ত (ভয়), রেজামন্দি (সন্তুষ্টি)-র উচ্চ মাকাম হাসিল করতে পারব। ইন শা আল্লাহ।

আল্লাহ তাআলা সম্পর্কিত আদাব

১. ইবাদত-বন্দেগী শুধু আল্লাহ তাআলাকে খুশি করার জন্য করব। আল্লাহ তাআলার সাথে কাউকে শরীক করব না। আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে দেখানোর জন্য ইবাদত করব না।

২. আল্লাহ তাআলার সম্মান ও মযাদার কথা মনে রেখে আচার-আচরণে সবসময় বিনয়ী থাকব। আমার মধ্যে সবসময় এই অনুভূতি জাগ্রত রাখব, আমি আল্লাহর বান্দা, আল্লাহর অসীম কুদরতের সামনে আমি কিছুই না। আমি আল্লাহর দেয়া বিধি-বিধান মেনে চলতে বাধ্য।

৩. সুখে-দুঃখে, বিপদাপদে একমাত্র আল্লাহ তাআলার ওপরই ভরসা রাখব।

৪. সবসময় আল্লাহ তাআলার প্রতি সুধারণা পোষণ করব। কোনো অবস্থাতেই আল্লাহ তাআলার প্রতি মন্দধারণা পোষণ করব না।

৫. উঠতে-বসতে আল্লাহ তাআলার দেয়া নেয়ামতের শোকর আদায় করব। কোনো অবস্থাতেই আল্লাহর দেয়া নেয়ামতের না-শোকরি করব না।

৬. আল্লাহ তাআলার হামদসানা পাঠ করার পর, আন্তরিক, বিনয়ী ভঙ্গিতে নিজের সমস্ত প্রয়োজনের কথা আল্লাহর কাছে তুলে ধরব।

৭. আল্লাহ তাআলাকে ভয় করব, তবে কোনো অবস্থাতেই আল্লাহর ক্ষমা ও রহমত থেকে নিরাশ হবো না।

৮. আল্লাহর নাফরমানি-অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকব। কখনো গুনাহ হয়ে গেলে সাথে সাথে তাওবা করে নিবো।
৯. সবসময় নিজেকে আল্লাহর সামনে দুর্বল মনে করব। নিজের মধ্যে কখনোই হামবড়া ভাব আসতে দিবো না।
১০. সবসময় আল্লাহর জিকিরে ফিকিরে থাকব।
১১. ব্যক্তিগত বিষয়ে আল্লাহর হুকুমকে চূড়ান্ত আর অকাট্য মনে করব। কখনোই আল্লাহর হুকুমের অবাধ্যতা করব না।
১২. আখেরাতে আল্লাহর সাথে সরাসরি সাক্ষাতের আগ্রহ পুষে রাখব।
১৩. আল্লাহ তাআলার প্রতি সম্মানসূচক শব্দ ব্যবহার করব। আল্লাহর জন্য মানানসই নয়, এমন শব্দবাক্য কখনো ব্যবহার করব না।
১৪. নিজের গুনাহ ও কমজোরির কথা স্বীকার করে আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা চাইতে থাকব। আল্লাহর কাছে ভবিষ্যতে ভালো হয়ে চলার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা পেশ করব।

নবুয়ত ও রেসালত সম্পর্কিত আদাব

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

১. সমস্ত নবিরাসুল হক। সমস্ত নবিরাসুলের প্রতি ঈমান রাখব।
২. সমস্ত নবিরাসুলের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা পোষণ করব। নবিরাসুল আল্লাহর বাছাইকরা বান্দা। তারা বিশেষ সম্মান ও মযাদার অধিকারী। নবিরাসুলগণ আল্লাহ তার সৃষ্টির মাঝে যোগাযোগের সেতুবন্ধন।
৩. নবীরাসুলের রেখে যাওয়া শিক্ষার ওপর আমল করার মাঝেই দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় সাফল্য নিহিত, মনেপ্রাণে এই বিশ্বাস পোষণ করব। সব নবিরাসুল ও তাদের আনীত শরিয়তের প্রতি ঈমান রেখে, আমরা শুধু আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লামের শরিয়তের অনুসরণ করব।

৪. সমস্ত নবীরাসুল মাসুম। গুনাহমুক্ত। আল্লাহর পক্ষ থেকে সুরক্ষিত।

৫. বিশ্বজগতে আল্লাহ তাআলার পরই নবীরাসুলের স্থান ও মযাদা।

৬. মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, সর্বশ্রেষ্ঠ নবী।

৭. মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তাআলার সর্বশেষ নবী ও রাসুল।

৮. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাফরমানি-অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকব।

৯. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে গিয়ে, তাকে আল্লাহর চেয়ে বেশি বা আল্লাহর মতো সম্মান করব না। আল্লাহ তাআলার জন্য নির্দিষ্ট কোনো গুণাবলীও রাসুলুল্লাহর ওপর আরোপ করব না।

১০. সর্বাবস্থায় রাসুলুল্লাহর আনুগত্য ও অনুসরণ করব।

১১. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর বেশি বেশি দুরূদ পাঠ করব।

১২. রাসুলুল্লাহর নাম উচ্চারণ করলে বা শুনলে, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলব।

১৩. রাসুলুল্লাহকে নিজের জানমাল, সন্তানসন্ততি, মা-বাবার চেয়েও বেশি মহব্বত করব।

আসমানি কিতাব সম্পর্কিত আদাব

১. সমস্ত আসমানি কিতাব হক। বড় আসমানি কিতাব চারটি, তাওরাত, যবুর, ইঞ্জিল, কুরআন। এছাড়া বিভিন্ন নবীরাসুলের ওপর অসংখ্য ছোট ছোট কিতাব নাযিল হয়েছে। সেগুলোকে সহিফা বলে। সবগুলো সত্য।

২. কুরআন নাযিল হওয়ার পর পূর্বে নাযিল হওয়া কিতাবগুলোর ওপর ঈমান রাখা আবশ্যক। বিধানের ক্ষেত্রে শুধু কুরআনের অনুসরণ করা ফরজ। কুরআনের আগে নাযিল হওয়া কিতাবগুলো নিজ নিজ যুগে আমল ও অনুসরণযোগ্য ছিল। কুরআন নাযিল হওয়ার পূর্ববর্তী কিতাবগুলো মানুসুখ বা রহিত হয়ে গেছে। একমাত্র কুরআন কেয়ামত পযন্ত কাযকর থাকবে, কখনো মানসুখ হবে না।

৩. পূর্ববর্তী কিতাবগুলো বিকৃত হয়ে গেছে। সেগুলোর অনুসারীরা নিজেদের ইচ্ছামতো রদবদল করে ফেলেছে। বিকৃত হয়ে যাওয়া কিতাবগুলো কোনো অমুসলিমের কাছে থাকলে, সেগুলোর অসম্মান করব না।

ফেরেশতা সম্পর্কিত আদাব

১. ফেরেশতাগণ নুরের তৈরি। তারা নারী বা পুরুষ কোনোটাই নন। আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদেরকে যে কাজের দায়িত্ব দেন, তারা সেটা পুরো দায়িত্বশীলতার সাথে আদায় করেন। ফেরেশতাগণ আল্লাহর বিশেষ কর্মীবাহিনী।

২. মুখে পেঁয়াজ-রসুনের গন্ধ নিয়ে মসজিদে যাওয়া থেকে বিরত থাকব। ফেরেশতাগণ এই গন্ধে কষ্ট পান।

৩. সমস্ত ফেরেশতা বিশেষ করে জিবরীলকে আমাদের কল্যাণকামী বলে বিশ্বাস করব। ইহুদিদের মতো জিবরীলকে শত্রু মনে করব না।

৪. ফেরেশতাদের সম্মান বজায় রাখব। তাদের শানে বেয়াদবিমূলক কথা বলব না।

৫. ফেরেশতাদের নিয়ে হাসিঠাট্টা করব না। মুশরিকদের মতো তাদেরকে আল্লাহর কন্যা মনে করব না। তাদেরকে আল্লাহর

বিশেষ সৃষ্টি বলে বিশ্বাস করব।

কেয়ামত সম্পর্কিত আদাব

১. কেয়ামত সত্য। কেয়ামতদিবসে সবাইকে নিজের আমলের হিসাব দিতে হবে। সেদিন ভালো কাজের জন্য পুরষ্কৃত করা হবে, মন্দকাজের জন্য সাজা মিলবে।

২. কবরের আযাব, বরযখের জীবন, কেয়ামত দিবসে কবর থেকে ওঠা, হাশরের মাঠে জমা হওয়া, হিসাব, আমলের পরিমাপ, পুলসিরাত, জান্নাত, জাহান্নাম সবই সত্য।

৩. দৈনন্দিন জীবনে কেয়ামত নিয়ে ঠাট্টা-মস্করা করব না। জান্নাত-জাহান্নাম নিয়েও হাসিকৌতুক করব না। আখেরাতের অস্তিত্বকে দিবালোকের চেয়েও বেশি সত্য বলে বিশ্বাস করব। মনে সবসময় আখেরাতের ভয় জাগিয়ে রাখার চেষ্টা করব।

৪. জান্নাত ও জাহান্নামের ফয়সালা আমার বিশুদ্ধ আকীদা ও নেকআমলের ওপর ভিত্তি করে হবে। শুধু মানবসেবা করলেই জান্নাত মিলে যাবে, জুলুম করলেই চিরজাহান্নামী হবে, এমন বিশ্বাস পোষণ করা উচিত নয়। নির্দিষ্ট কোনো দল বা গোষ্ঠীভুক্ত হলেই জান্নাত মিলে যাবে, এমন বিশ্বাস পোষণ করাও উচিত নয়।

তাকদীর সম্পর্কিত আদাব

১. মানবসৃষ্টির বহু আগেই আল্লাহ তাআলা মানুষের ভালোমন্দ লিখে রেখেছেন। আল্লাহ তাআলা মানুষকে ভালোমন্দ বেছে নেয়ার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দিয়েছেন। বান্দা নিজ ইচ্ছাশক্তি ব্যবহার করে কোনটা বেছে নেবে, সেটা আল্লাহ আগে থেকেই জানেন। এটাকে বলা হয় 'ইলমে ইলাহি'-আল্লাহর ইলম। বান্দা নিজ ইচ্ছাশক্তি

ব্যবহার করে যে বিষয়টা বেছে নিবে, সেটা আল্লাহ তাআলা আগে থেকেই লিখে রেখেছেন। এটাকে বলা হয়, আমরে ইলাহি-আল্লাহর আদেশ।

২. ইলমে ইলাহি কখনোই আমরে ইলাহির বিপরীত হয় না। আমরে ইলাহিও কখনো ইলমে ইলাহির বিপরীত হয় না। ইলমে ইলাহি ও আমরে ইলাহির সমন্বিত রূপকে তাকদীর বলা হয়।

৩. তাকদীর সম্পর্কিত মাসআলা বুঝতে না পারলে, তাকদীর অস্বীকার করে বসব না। আমার বুঝশক্তি কম মনে করে, চুপ থাকব।

৪. কোনো কাজ নিজের অযোগ্যতার কারণে করতে না পারলে, সেখানে তাকদীরের ওপর দোষ চাপিয়ে দায় সারার চেষ্টা করব না। হাঁ, কাজটা হবে না, সেটা আমার তাকদীরে লেখা ছিল, একথা সত্যি। কাজটা যে আমার দুর্বলতা, অলসতা বা অক্ষমতার কারণে হয়নি, সেটা স্বীকার করে নেয়াই সততার পরিচায়ক।

(ইসলামী আকীদা বিষয়ক লেখায় তাকদীর সম্পর্কে আরো কথা থাকবে, ইন শা আল্লাহ)

সাহাবায়ে কেরাম ও আহলে বাইত সম্পর্কিত আদাব

১. আম্বিয়ায়ে কেরামের পর, সাহাবায়ে কেরাম ও আহলে বাইত জগতের সবচেয়ে সম্মানিত আর শ্রেষ্ঠ মানুষ। তাদেরকে মহব্বত করা ঈমানের অংশ।

২. আহলে বাইত বলে প্রথমত উম্মাহাতুল মুমিনীন উদ্দেশ্য। তারপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সন্তান-সন্ততি, মেয়েজামাই, নাতিনাতকুর।

৩. সাহাবায়ে কেরামকে আল্লাহর বাছাই করা, পাক্কা-সাচ্চা মুমিন বিশ্বাস করব।

৪. সাহাবায়ে কেরামকে আদেল-ইনসাফকারী বিশ্বাস করব। সাহাবায়ে কেরাম আদেল হওয়ার অর্থ, শরিয়তের বিধিবিধানের ব্যাপারে তাদেরকে সাক্ষ্যদানের উপযুক্ত মনে করা, তাদের কথাকে সত্যিকার সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করা। ইসলামী শরিয়াত দাঁড়িয়ে আছেই সাহাবায়ে কেরামের বর্ণনা আর সাক্ষ্যের ওপর। হোক সেটা কুরআন বা হাদীস। আমরা সাহাবায়ে কেরামের বর্ণনার মাধ্যমেই কুরআন ও হাদীস পেয়েছি। সাহাবায়ে কেরামের বর্ণনা ও সাক্ষ্য সঠিক মানতে গেলে অবধারিতভাবে তাদের ব্যক্তিত্বকেও আদেল মানতে হয়।

৫. সাহাবায়ে কেরামকে 'মাহফুজ'-সুরক্ষিত বিশ্বাস করব। মাহফুজ মানে, মানবীয় প্রবৃত্তির তাড়নায় যদি কোনো সাহাবী কখনো কোনো ভুল করেও বসেন, আল্লাহ তাআলা তাদের আমলনামায় সেই ভুলের গুনাহ আখেরাত পযন্ত অবশিষ্ট রাখেননি, দুনিয়াতেই তাদের ভুলত্রুটি মাফ করে দিয়েছেন। ভুলের কারণে অবধারিত পরকালীন আযাব থেকে আল্লাহ সাহাবায়ে কেরামকে মাহফুজ করে নিয়েছেন। আম্বিয়ায়ে কেরাম মাসুম। মাসুম মানে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে গুনাহ করা থেকেই সুরক্ষিত রেখেছেন।

৬. সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম মেইয়ারে হক-সত্যের মাপকাঠি। মেইয়ারে হক মানে, আল্লাহ তাআলার কাছে ঐ ব্যক্তির আমল গ্রহণযোগ্য হবে, যার আমল সাহাবায়ে কেরামের আমলের সাথে মিলবে। কারো ঈমান-আমল সাহাবায়ে কেরামের মতো না হলে, তার ঈমান-আমল আল্লাহর দরবারে গৃহীত হবে না। সে যত ভালো কাজই করুক, তাকে মুমিন বা নেককার বলা যাবে না।

৭. সমস্ত সাহাবী সমালোচনার উর্ধে, একথা বিশ্বাস করব। তাদের কোনো কথা বা কাজের এমনভাবে বিশ্লেষণ করতে যাবো না, যাতে তাদের ব্যক্তিত্ব প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে বা তাদের মযাদাহানি

ঘটে।

৮. সমস্ত সাহাবীকে জান্নাতি বিশ্বাস করব। একমুহূর্তের জন্যও কোনো সাহাবী জাহান্নামে দাখিল হবেন না। জাহান্নামের একফোঁটা ধোঁয়াও তাদের শরীরে লাগবে না। রোজহাশরে তারা আল্লাহর রহমতে সোজা জান্নাতে চলে যাবেন।

৯. সাহাবায়ে কেরামকে পরকালীন আযাব থেকে মাহফুজ বিশ্বাস করব।

১০. সমস্ত সাহাবীকে এই উম্মতের শ্রেষ্ঠতম সন্তান বিশ্বাস করব। তাদের মতো অনুপম, পূণ্যবান মানবসন্তান পূর্ববর্তী কোনো উম্মতের মধ্যে সৃষ্টি হয়নি, কেয়ামত পযন্ত হবেও না। আম্বিয়ায়ে কেরামের পর সাহাবায়ে কেরামই আল্লাহর শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি।

১১. সাহাবায়ে কেরামের ইজমা (সম্মিলিত ঐক্যমত্য-কে মাসুম-ভুলমুক্ত বিশ্বাস করব।

১২. সবসময় সাহাবায়ে কেরামের কল্যাণকর দিকগুলো আলোচনায় রাখব।

১৩. সাহাবায়ে কেরামকে গালি দেয়া ও তাদের সমালোচনাকে হারাম বিশ্বাস করব।

১৪. সাহাবায়ে কেরামের প্রতি মহব্বত পোষণকে ঈমানের আলামত জানব।

১৫. সাহাবায়ে কেরামের সমালোচক ও দুশমনের সংশ্রব সযত্নে এড়িয়ে চলব।

১৬. খোলাফালে রাশিদিন চারজন। সাইয়িদুনা আবু বকর সিদ্দীক, সাইয়িদুনা উমর ফারুক, সাইয়িদুনা উসমান যুন্নুরাইন ও সাইয়িদুনা আলি মুরতাজা। রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন।

১৭. সর্বশ্রেষ্ঠ সাহাবী সাইয়িদুনা আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু। তারপর পযায়ক্রমে তিন খলীফা।

১৮. সমস্ত সাহাবীর প্রতি গভীর মহব্বত ও পোক্ত আকীদত রাখব।
১৯. ঐতিহাসিক বর্ণনা শুনে বা পড়ে ভ্রান্তদলের মতো সাহাবায়ে কেরামের প্রতি কু-ধারণা পোষণ করব না।
২০. যখনই কোনো সাহাবীর নাম শুনব বা উচ্চারণ করব, পরম মহব্বতের সাথে তার জন্য দোয়া করব, রাদিয়াল্লাহু আনহু।

ফোকাহা ও মুহাদ্দিসীন সম্পর্কিত আদাব

১. ফোকাহা ও মুহাদ্দিসীনকে উম্মাহর প্রতি মুহসিন-অনুগ্রহকারী বিশ্বাস করব। ফোকাহা কুরআন ও সুন্নাহ থেকে মাসায়েল ইস্তেম্বাত-আহরণ করে উম্মতের জন্য শরিয়ত মেনে চলা সহজ করে দিয়েছেন। মুহাদ্দিসীনে কেরাম হাদীস শরীফ জমা করে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন।
২. ফোকাহা ও মুহাদ্দিসীনে কেরামকে সম্মান করব। কোনো ফকিহ বা মুহাদ্দিস সম্পর্কে অসমীচিন, অশোভন উক্তি উচ্চারণ করব না।
৩. কখনো এমন মনে করব না, আমাদের ইলম স্বর্ণযুগের ফোকাহা-মুহাদ্দিসীনের ইলমের চেয়ে বেশি। বরং এই বিশ্বাস পোষণ করব, তাদের ইলম আমাদের ইলমের তুলনায় অনেক বেশি ছিল, তাকওয়া-পরহেযগারিতেও তারা আমাদের চেয়ে বহু উর্ধে ছিলেন।
৪. ফোকাহা-মুহাদ্দিসীনে কেরামের পারস্পরিক এখতেলাফ-মতবিরোধকে অবজ্ঞা, তাচ্ছিল্য বা সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখব না।
৫. বলায়, লেখায় এমন কিছু প্রকাশ করব না, যাতে করে ফোকাহা-মুহাদ্দিসীনের প্রতি জনমনে বিতৃষ্ণা সৃষ্টি হয়। এমন কথা প্রচারে সচেষ্ট থাকব, উম্মাহর বর্তমান প্রজন্ম বিগত প্রজন্মের ঈমান-আকীদা ও আমলের সাথে জুড়ে থাকার মাঝে সার্বিক কল্যাণ নিহিত। ফোকাহা-মুহাদ্দিসীন থেকে বর্তমান প্রজন্ম বিচ্ছিন্ন হয়ে

যাওয়া ঈমান-আমলের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ।

৬. ফোকাহা-মুহাদ্দিসীন মাসুম নন। তারা মানুষ। তাদের ভুলত্রুটি হওয়া সম্ভব। তাদের ভুলগুলো ধরে ধরে উম্মতের মাঝে প্রচারে নেমে পড়া সুস্থ চিন্তার পরিচায়ক নয়। এটা সুস্পষ্ট ফাসাদ-বিশৃঙ্খলা। কোনো মাসআলায় ফোকাহা-মুহাদ্দিসীনের ভুল হয়ে গেলে, একথা বিশ্বাস রাখব, তারা তাদের মেহনত-মুজাহাদা ও ইজতিহাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি সওয়াব লাভ করবেন।

৭. কোনো ফকিহের ফিকহ সম্পর্কে কস্মিণকালেও এমন ধারণা পোষণ করব না, তার ফিকহ (মাআযাল্লাহ) কুরআন ও সুন্নাহর বিপরীত। একমাত্র কাট্টা শয়তানই এমন চিন্তা করতে পারে।

৮. ফোকাহায়ে কেরাম সম্পর্কে এমন চিন্তা পোষণ করব না যে, তারা (মাআযাল্লাহ) নবুয়তের মাকামে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ফোকাহায়ে কেরাম নিজ যোগ্যতা ও ইলম অনুযায়ী কুরআন ও সুন্নাহর ব্যাখ্যা করে গেছেন। অন্যভাবে বলতে গেলে, তারা শারে (শরিয়তপ্রণেতা) ছিলেন না; শারেহ (শরিয়তের ব্যাখ্যাকারী) ছিলেন।

৯. মুহাদ্দিসীনে কেরাম সম্পর্কে কখনোই এমন চিন্তা করব, তারা কুরআনের বিপরীতে (মাআযাল্লাহ) মনগড়া হাদীস রচনা করে গেছেন। মুহাদ্দিসীনে কেরাম অতিমানবিক পরিশ্রম করে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী সংরক্ষণ করেছেন। কারণ, নবীজির হাদীসগুলোই কুরআনের ব্যাখ্যা।

১০. ফোকাহা-মুহাদ্দিসীনে কেরামের জন্য নিয়মিত মাগফিরাতের দোয়া করে যাবো। তাদের জন্য গুরুত্বের সাথে ঈসালে সওয়াবের ব্যবস্থা করব।

ওলামায়ে কেরাম সম্পর্কিত আদাব

১. ওলামায়ে কেরামের প্রতি আদব-এহতেরাম বজায় রাখব। তাদের সাথে মহব্বত ও আকীদতপূর্ণ আচরণ করব।

২. নিয়মিত ওলামায়ে দীনের খেদমতে হাজির হয়ে দীনি বিষয়ে তাদের দিক-নির্দেশনা লাভ করব। দুনিয়াবি বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ করব।

৩. কোনো আলেমে দীনের কাছে গেলে, তার সুবিধা-অসুবিধা, জরুরত-প্রয়োজনের প্রতি খেয়াল রাখব।

৪. ওলামায়ে কেরামের মাহফিলে আদব-এহতেরামের সাথে শরিক হবো। মাহফিলের যেখানে জায়গা মিলবে, বসে যাবো।

৫. কোনো মজলিসে ওলামায়ে কেরাম উপবিষ্ট থাকলে, আলোচনা-সমালোচনা, তর্কবিতর্কে জড়াব না। চুপচাপ ওলামায়ে কেরামের কথা শ্রবণ করব।

৬. যখনো আলিমে দীন কথা বলেন, তার কথা কাটব না, তার কথায় বিঘ্ন ঘটে এমন কিছু করব না। হক্কানী আলিমের কথা চলাকালে এমন অভিব্যক্তি প্রকাশ করব, যাতে মনে হয়, আমি তার প্রতি বেজার। কথা অপছন্দ না অসহ্য মনে হলে, স্বভাবের বিপরীতে গিয়ে হলেও, সর্বোচ্চ ধৈয্য ধারণ করে চুপচাপ আলিমের কথা শুনে যাবো।

৭. কোনো হক্কানী আলিমের আর্থিক অবস্থা দুর্বল হলে, সম্মানজনক পন্থায় সাধ্যমতো পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করব।

৮. আলিমের দীনের কোনো দুর্বল দিক সামনে চলে এলে, যথাসম্ভব লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করব। আলিমের দোষত্রুটি জনসমক্ষে প্রচার করে তাকে অপদস্থ করা থেকে বিরত থাকব।

৯. আলিমে দীনের প্রতি নিজেও মন্দধারণা পোষণ করব না, অন্যকেও মন্দধারণা পোষণ করা থেকে বাঁচিয়ে রাখার কোশেশ

করব।

১০. যখন কেউ আলিমে দীনের গীবত করে, তার কথায় কর্ণপাত করব না। নিজেও কোনো আলিমের গীবত করব না, অন্যের গীবত শুনবও না।

১১. ওলামায়ে কেরামের বিরুদ্ধে আয়োজিত কোনো অনুষ্ঠানে যোগ দেয়া থেকে বিরত থাকব। বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়াতে কোনো হক্কানি আলিমের বিরুদ্ধে চলমান ট্রেন্ড থেকে নিজেকে সযত্নে সরিয়ে রাখব। ওলামায়ে কেরামের বিরুদ্ধে চলমান প্রপাগাণ্ডা রোধের চেষ্টা করব। ওলামায়ে কেরামের সম্মান রক্ষায় সক্রিয় ভূমিকা রাখার চেষ্টা করব।

আজানের আদাব

১. ওজু অবস্থায় আজান দিবো।

২. মুয়াযযিনের করণীয় সম্পর্কিত মাসায়েল জেনে নিব। নামাযের সময় সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানার চেষ্টা করব।

৩. মুয়াযযিন দীনদার, পরহেযগার হওয়া ভালো।

৪. মুয়াযযিন উঁচু ও উত্তম কণ্ঠস্বরের অধিকারী হওয়া উচিত।

৫. কেবলামুখি হয়ে আজান দিব।

৬. আজানের সময় দুই কানের ছিদ্রে আঙুল রাখব।

৭. দাঁড়িয়ে আজান দিবো।

৮. হাইয়া আলাস সলাহ বলার সময় চেহারা ডানদিকে, হাইয়া আলাল ফালাহ বলার সময় চেহারা বামদিকে ফেরাব। খেয়াল রাখব কাঁধ যাতে কেবলার দিক থেকে সরে না যায়, শুধু চেহারা ঘুরবে।

৯. ফজরের আজানে হাইয়া আলাল ফালাহ বলার পর দুইবার 'আসসলাতু খাইরুম মিনান নাওম' বলব।

১০. আজানের বাক্যগুলো ধীরে ধীরে থেমে থেমে উচ্চারণ করব।
১১. আজানের বাক্যগুলো আলাদা আলাদা করে উচ্চারণ করব।
১২. আজানের মাঝে কোনো কথা বলব না।
১৩. গানের সুরে আজান দিবো না।
১৪. আজান শুরু হলে কথাগল্পপাঠ বন্ধ করে আজানের জবাব দিবো। মুয়াযযিন যা বলে, হুবুহু সেটাই বলব। উভয় 'হাইয়া'র জবাবে লা হাওলা ওয়ালা কুউয়াতা ইল্লা বিল্লাহ বলব।
১৫. মুয়াযযিন ও শ্রোতা উভয়ে আজানের পর প্রথমে দুরুদ শরীফ, তারপর আজানের দোয়া পড়ব,

اللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা রাব্বা হাযিহিদ্ দাওয়াতিত তাম্মাহ, ওয়াস্-সালাতিল কায়িমাহ, আতি মুহাম্মাদানিল-ওয়াসীলাতা ওয়াল-ফাদীলাহ, ওয়াবআস্হু মাক্বামাম মাহমূদানিল্লাযী ওয়াআ'ত্তাহ। ইন্নাকা লা তুখলিফুল মীআদ।

হে আল্লাহ! এই পরিপূর্ণ আহ্বান এবং কায়েম হওয়া নামাযের প্রভু, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে ওয়াসীলা (জান্নাতে একটি বিশেষ মর্যাদার স্থান) ও ফাদীলা (অতিরিক্ত মর্যাদা) দান করুন, এবং তাঁকে সেই মাহমূদ (প্রশংসিত) অবস্থানে স্থান দিন, যার প্রতিশ্রুতি আপনি তাঁকে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আপনি প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না।

১৬. আজান হয়ে যাওয়ার পর অতীব জরুরি প্রয়োজন ছাড়া মসজিদ থেকে বের হবো না।

১৭. আজান মসজিদের বাইরে থেকে দেয়া উত্তম।
১৮. মাইক না থাকলে, উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে আজান দেয়া উত্তম।

একামতের আদাব

১. একামত মজিদের ভেতরে দেয়া উত্তম।
২. যিনি আজান দিয়েছেন, তিনিই একামত দেয়া ভালো। মুয়াযযিনের অনুমতিক্রমে অন্য কেউ একামত দিলে সমস্যা নেই।
৩. আজানের তুলনায় একামতের বাক্যগুলো কিছুটা দ্রুতলয়ে বলা উত্তম।
৪. একামতের দুটি বাক্য মিলিয়ে বলা উত্তম। প্রতিটি বাক্যের শেষ হরফে জযম দেয়া উত্তম।
৫. একামত দেয়া ও শ্রবণকালে কোনো কথা না বলা।
৬. গানের সুরে একামত না দেয়া।
৭. হাইয়া আলাস সালাহ বলার সময় ডানদিকে চেহারা ফেরানো, হাইয়া আলাল ফালাহ বলার সময় চেহারা বামদিকে ফেরানো। খেয়াল রাখব, কাঁধ যেন না ফেরে। কাঁদ কেবলা বরারবার থাকবে।
৮. একামতের জবাব দিবো। কদ কামাতিস সলাহের জবাবে আকামাহাল্লাহু ওয়া আদামাহা বলব।

নামাযের আদাব

নামাযের সাধারণ আদাব

১. নামাযের মাসায়েল শিখে নিবো। নামাযের ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত, মুস্তাহাবগুলো মনে রাখার চেষ্টা করব। নামাযে যখন যে কাজ করছি, সেটা ফরজ, ওয়াজিব না সুন্নত সেটা মনে রাখার চেষ্টা করব।
২. নামাযের সময় হওয়ার আগেই নামাযের তৈয়ারি শুরু করে দিবো।

৩. নামাযের জন্য পাকসাফ ও উত্তম পোশাক পরব। মানুষের সামনে পরা যায় না, যেসব পোশাক পরাকে মানুষ পছন্দ করে না, এমন পোশাক পরে নামায আদায় করব না।

৪. মাথা ঢেকে নামায পড়ব।

৫. জামাতের সাথে নামায পড়াকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিবো।

৬. নামায আদায়ের জন্য মসজিদে প্রশান্ত, নিশ্চিন্ত আর আত্মবিশ্বাসী পদক্ষেপে মসজিদে গমন করব।

৭. জামাতের অপেক্ষায় থাকাকালে মুসল্লিদের সাথে অহেতুক কথাবার্তায় জড়াব না।

৮. গুরুত্বের সাথে কাতার সোজা করব। কাতারের মাঝে ফাঁক রাখব না, মিলামিল হয়ে দাঁড়াব।

৯. খুশুখুযুর সাথে নামায আদায় করব। খুশুখুযু মানে গভীর মনোযোগ আর ধীরস্থিরতা।

১০. নামায আদায়কালে ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নতের প্রতি খেয়াল রাখব।

১১. নামায আদায়কালে এদিক-সেদিক তাকাব না।

১২. নামাযে তিলাওয়াতকালে অর্থ বুঝে পড়ার চেষ্টা করব।

১৩. একরাকাতে পুরো একটি সূরা পড়ার চেষ্টা করব। সূরা বড় হলে, আংশিক পড়লে চলবে।

১৪. দ্বিতীয় রাকাতের তুলনায় প্রথম রাকাতের কেরাত দীর্ঘ করব।

১৫. ধীরস্থিরভাবে নামায আদায় করব; কোনো অবস্থাতেই তাড়াহুড়া করব না।

১৬. নামাযে হাই এলে চেপে রাখার চেষ্টা করব।

১৭. নামাযে চোখ খোলা রাখব।

১৮. নামাযে আঙুলের মটকা ফোটাব না।

১৯. নামাজরত ব্যক্তির সামনে দিয়ে হাঁটাচলা করব না। লোক

চলাচলের আংশকা থাকলে, সামনে সুতরা রেখে নামায শুরু করব।
২০. নামাযের পর মাসনুন আযকার পড়ব।
২১. পুরুষরা মসজিদে জামাতে শরিক হওয়ার ব্যাপারে যত্নবান থাকব।
২২. নফল-সুন্নত ঘরে আদায় করার চেষ্টা করব।
২৩. গ্রীষ্মকালে জোহর কিছুটা বিলম্ব করে, শীতকালে কিছুটা আগে পড়ব।

নামাযের আরাকান সম্পর্কিত আদাব

কিয়ামকালে

১. কেবলামুখি হয়ে দাঁড়াব। দৃষ্টি সিজদার স্থানে নিবদ্ধ থাকবে। গর্দান কিছুটা ঝুঁকিয়ে, চিবুক সীনার সাথে না ছুঁইয়ে নত হয়ে দাঁড়াব। সীনা বাঁকাব না, ঝোঁকাব না, সোজা রাখব।
২. পায়ের আঙুলগুলো কেবলামুখি করে রাখব।
৩. দুইপায়ের মাঝে উপযুক্ত পরিমাণ ফাঁকা রাখব। পা বেশি ছড়িয়ে দেব না, একদম লাগিয়েও রাখব না। সর্বনিম্ন চার আঙুল পরিমাণ হতে পারে।
৪. সূরা ফাতিহার প্রতিটি আয়াত আলাদা করে তিলাওয়াত করব। প্রতিটি আয়াতে থামব। দুই আয়াত একসাথে মিলিয়ে পড়ব না।

রুকুতে

১. রুকুতে যাওয়া শুরু হওয়ার সাথে সাথে রুকুর তাকবীর বলা শুরু হবে, রুকুতে পৌঁছার সাথে সাথে তাকবীর শেষ হবে। প্রতিটি রোকনের ক্ষেত্রেও একই কথা। নড়াচড়া শুরুর সাথে সাথে তাকবীর শুরু হবে, নড়াচড়া থামার সাথে সাথে তাকবীরধ্বনি বন্ধ হবে।

২. পুরুষ রুকুতে গিয়ে আঙুলগুলো ছড়িয়ে, খাবলা দিয়ে হাঁটু আঁকড়ে ধরবে। দুই হাতের কনুই পাঁজর থেকে আলাদা রাখবে। কোমর, মেরুদণ্ড, পিঠ সোজা রাখবে। মাথাকে পিঠ বরাবর উঁচু রাখবে। মাথা যেন পিঠের চেয়ে উঁচু না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখবে।
নারীগণ রুকুতে এতটুকু পরিমাণ ঝুঁকবেন, যাতে কোনোমতে দুইহাত দিয়ে হাঁটু ছোঁয়া যায়। পুরুষরা যেভাবে দুইহাতে শক্ত করে হাঁটু আঁকড়ে ধরে, সেভাবে ধরবে না, হাঁটুর ওপর আলতো করে দুই হাতের তালু সোজা করে রাখলেই হবে। রুকুকালে কনুইকে পাঁজরের সাথে একেবারে মিলিয়ে রাখবে।
৩. ধীরস্থিরভাবে রুকু করবে। রুকুতে চোখের দৃষ্টি দুই পায়ের মাঝে নিবদ্ধ থাকবে।

রুকু থেকে ওঠার সময়

১. রুকু থেকে পুরোপুরি সোজা হয়ে দাঁড়াবে। শরীর সামান্যতম বেঁকে বা ঝুঁকে যেন না থাকে।
২. রুকু থেকে ওঠার পর চোখের দৃষ্টি সিজদার স্থানে নিবদ্ধ থাকবে।

সিজদায়

১. পুরুষ দাঁড়ানো থেকে সিজদায় যাওয়ার সময় পিঠ-মাথা সোজা রাখবে। প্রথমে দুই হাঁটু মাটি স্পর্শ করবে, তারপর দুইহাতের তালু মাটিতে রাখবে, তারপর নাক, তারপর কপাল মাটি স্পর্শ করবে। খেয়াল রাখতে হবে, সিজদায় যাওয়ার সময় মাথা ও সীনা যেন সোজা থাকে। হাঁটু মাটি স্পর্শ করার পর সীনা সিজদার দিকে ঝুঁকবে।
নারীগণ দাঁড়ানো থেকেই সীনা-মাথা ঝুঁকিয়ে সিজদায় যাবে। প্রথমে হাঁটু মাটি স্পর্শ করবে, তারপর হাত, তারপর নাক, তারপর কপাল

মাটি স্পর্শ করবে।

২. পুরুষ সিজদায় পেটকে দুই রান থেকে পৃথক করে রাখবে। পেট ও রানের মাঝে ফাঁকা রাখবে। কনুইকে মাটি থেকে উঁচুতে তুলে রাখবে, পাঁজর থেকে পৃথক রাখবে। নিতম্ব উঁচু করে রাখবেন।

নারীগণ এর সম্পূর্ণ বিপরীত করবেন। উদরকে রানের সাথে মিলিয়ে রাখবে। দুই বাহু পাঁজরের সাথে মিলিয়ে রাখবে। কনুইসহ পুরো বাহুকে মাটির সাথে বিছিয়ে রাখবে।

৩. পুরুষ সিজদাকালে দুইপা দাঁড় করিয়ে রাখবে। দুইপায়ের আঙুল যেন মাটির সাথে লেগে থাকে, সেদিকে খেয়াল রাখবে। কোনো অবস্থাতেই যেন সিজদাকালে পায়ের আঙুল মাটি থেকে উঠে না যায়। হাত-পায়ের আঙুল কেবলামুখি করে রাখবে।

নারীগণ দুই পা খাড়া করে রাখার বদলে ডানদিকে বের করে শুইয়ে রাখবেন। নিতম্ব বামদিকের মাটিতে রাখবেন। কোমর ও পিঠ সোজা রাখবেন। যথাসম্ভব দুই পায়ের আঙুল কেবলামুখি করে রাখবে।

৪. দুইহাতের আঙুলগুলো একটার সাথে আরেকটা লাগিয়ে, হাতের তালুসহ মাটির সাথে মিশিয়ে রাখবে।

৫. মাটিতে কপাল ঠেকিয়েই তুলে ফেলব না, ধীরস্থিরভাবে তাসবীহ পাঠ করে সিজদা থেকে মাথা তুলব।

দুই সিজদার মাঝে

১. পুরুষ বামপা মাটির সাথে বিছিয়ে তার ওপর বসবে। ডানপা দাঁড় করিয়ে রাখবে। দুইহাত রানের ওপর রাখবে। আঙুলগুলো কেবলামুখি থাকবে। আঙুলগুলো স্বাভাবিক থাকবে। সিজদার মতো আঁটসাঁট করে একটার সাথে আরেকটা মিলিয়ে রাখতে হবে না।

নারীগণ সিজদা থেকে উঠে দুই পা ডানদিকে উত্তরমুখি করে বিছিয়ে রাখবে। বামদিক ঘেঁষে মাটির ওপর বসবে। দুইহাত রানের ওপর

রাখবে। আঙুল কেবলামুখি থাকবে।
২. বসাবস্থায় নজর কোলের ওপর থাকবে।

দ্বিতীয় সিজদা করা ও ওঠা

১. দ্বিতীয় সিজদাতেও প্রথমে দুইহাত মাটিতে রাখবে, তারপর নাক তারপর কপাল মাটি স্পর্শ করবে।
২. সিজদা থেকে ওঠার সময় প্রথমে কপাল, তারপর নাক, তারপর হাত, তারপর হাঁটু মাটি থেকে উঠবে।
৩. সিজদা বা বৈঠক থেকে উঠে দাঁড়ানোর সময় মাটিতে হাত লাগিয়ে ঠেক দিয়ে না ওঠা উত্তম। তবে শরীর ভারী হলে, অসুস্থ হলে ঠেক দিয়ে ওঠা যাবে।

সালাম ফেরানোর সময়

১. সালাম ফেরানোর সময় গর্দান এই পরিমাণ ফেরাবো, যাতে পেছনে কেউ থাকলে আমার একপাশের গাল পুরো দেখতে পায়।
২. সালাম ফেরানোর সময় নজর নিজের কাঁধের ওপর নিবদ্ধ থাকবে। প্রথম সালাম ফেরানোর সময় নিয়ত থাকবে, ডানদিকে যত ফিরিশতা আছেন, তাদেরকে সালাম করছি, দ্বিতীয় সালাম ফেরানোর সময় নিয়ত থাকবে, বামদিকে যত ফিরিশতা আছেন, তাদেরকে সালাম করছি।

কুরআন তিলাওয়াতের আদাব

১. ওজু অবস্থায় তিলাওয়াত করব। কুরআন কারীম না ছুঁয়ে তিলাওয়াত করলে, ওজু করা মুস্তাহাব। ওজু ছাড়াও তিলাওয়াত করা জায়েজ। কুরআন কারীম ছুঁতে হলে ওজু করা জরুরি।

২. কুরআন কারীমের প্রতি সম্মানের নিয়তে তিলাওয়াতের আগে মিসওয়াক করে নিব।
৩. তিলাওয়াতের আগে খুশবু মেখে নিবো।
৪. পাকসাফ জায়গায় বসে তিলাওয়াত করব।
৫. সম্ভব হলে কেবলামুখি হয়ে তিলাওয়াত করব।
৬. তিলাওয়াতের আগে 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বনির রজীম' পড়ব।
৭. তারপর বিসমিল্লাহ পড়ব। সূরা তাওবা দিয়ে তিলাওয়াত শুরু হলে, স্বাভাবিক নিয়মে আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ পড়ব। আগে থেকে তিলাওয়াত করতে করতে সূরা তাওবা সামনে এলে, বিসমিল্লাহ না পড়েই সূরা তাওবা শুরু করে দিব।
৮. তারতীলের সাথে তিলাওয়াত করব। তারতীল মানে ধীরে ধীরে থেমে থেমে তিলাওয়াত করা। তাজবীদের সাথে তিলাওয়াত করব। তাজবীদ মানে, হরফগুলো শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করা।
৯. সাধ্যমতো সুর করে পড়ার চেষ্টা করা।
১০. জাহান্নাম, আযাব, গযবের বর্ণনা সম্বলিত আয়াত কেঁদে কেঁদে তিলাওয়াত করা উচিত। কান্না না এলে, কান্নার ভান করে তিলাওয়াত করব। আয়াতে বর্ণিত বিষয় থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাইব।
১১. নেয়ামত, সুসংবাদ, জান্নাতের বর্ণনা সম্বলিত আয়াতগুলো আনন্দচিত্তে তিলাওয়াত করব। আয়াতে বর্ণিত বিষয়গুলো আল্লাহর কাছে চাইব।
১২. সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করে, সিজদা দিবো।
১৩. অর্থ বুঝে বুঝে তিলাওয়াত করার চেষ্টা করব।
১৪. কুরআনের প্রতি সম্মান রেখে তিলাওয়াত করব। তাড়াহুড়া না করে শান্তস্থির হয়ে তিলাওয়াত করব।
১৫. তিলাওয়াতকালে দুনিয়াবি কথাবার্তা বলব না।

১৬. তিলাওয়াতকালে একথা চিন্তা করব, আল্লাহ তাআলা আমার সাথে কথা বলছেন, আমিও আল্লাহ তাআলার সাথে কথা বলছি।
১৭. সূরা দুহা থেকে শেষ পযন্ত প্রতিটি সূরা শেষ করে আল্লাহু আকবার বলব।
১৮. একবার খতম শেষ হওয়ার সাথে সাথে আরেকবার শুরু করে দেয়া।
১৯. কুরআন খতমের দিন সম্ভব হলে রোযা রাখা।
২০. আমলের নিয়তে তিলাওয়াত করা। তিলাওয়াতকালেও আমলের নিয়ত করা। তিলাওয়াতশেষেও আমলের নিয়ত করা।
২১. হাফেয সাহেবগণ বারবার কুরআন খতম করতে থাকা।
২২. হাদীসে যেসব সূরা সম্পর্কে বিশেষ ফজিলত বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো তিলাওয়াত করে ফজিলত লাভের চেষ্টা করা। বিশেষ কোনো দিনে, বিশেষ কোনো সময়ে নির্দিষ্ট কোনো সূরা তিলাওয়াতের ফজিলত হাদীসে বর্ণিত হলে, সেটা হাসিলের চেষ্টা করা।
২৩. আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়তে তিলাওয়াত করা। পার্থিব সুযোগসুবিধা লাভের উদ্দেশ্যে তিলাওয়াত না করা।
২৪. ভোরে সূরা ইয়াসিন তিলাওয়াত করা।
২৫. মাগরিবের পর সূরা ওয়াকিয়া তিলাওয়াত করা।
২৬. শোয়ার আগে সূরা মুলক ও সূরা সাজদা তিলাওয়াত করা।
২৭. প্রতিদিন সূরা কাহফের প্রথম ১০ আয়াত তিলাওয়াত করা।
২৮. বৃহস্পতিবার মাগরিবের পর থেকে জুমাবার মাগরিবের আগে আগে সূরা কাহফ তিলাওয়াত করা।
২৯. জুমার রাতে সূরা দুখান তিলাওয়াত করা।
৩০. রাতে শোয়ার আগে, সূরা ইখলাস, ফালাক, নাস পড়ে হাতে ফুঁ দিয়ে পুরো শরীরে মোছা। এভাবে তিনবার করা। প্রথমে মাথা, তারপর চেহারা, তারপর শরীরের সামনের অংশ, তারপর পেছনে

যতদূর হাত যায়, মুছে দেয়া।

৩১. নামাযে মাসনুন কেরাত তিলাওয়াত করব। ফজরের সুন্নতে প্রথম রাকাতে সূরা কাফিরূন, দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ইখলাস। মাগরিবের সুন্নতেও তাই। বিতিরে সূরা আলা, কাফিরুন ও ইখলাস তিলাওয়াত করব।

আল্লাহর যিকিরের আদাব

১. সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিকির করব।

২. লোকদেখানোর জন্য নয়, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে যিকির করব।

৩. মুখে যিকিরের শব্দ উচ্চারণের সাথে সাথে অন্তরকেও আল্লাহ অভিমুখী রাখব।

৪. নিচু আওয়াজে যিকির করা বৈধ, উঁচু আওয়াজেও বৈধ। অবস্থা ও পরিবেশভেদে উচ্চ আওয়াজে যিকির করা যেতে পারে। আশেপাশের লোকজনের ক্ষতি না হলেই হল।

৫. আশেপাশে কোনো ব্যক্তি নামাযে, তিলাওয়াতে, ঘুমিয়ে থাকলে, উঁচু আওয়াজে যিকির করা উচিত নয়। অসুস্থ ব্যক্তির পাশেও নয়।

৬. ফরজ বিধানকে নফল যিকিরের ওপর সবসময় প্রাধান্য দিব। নামাযের সময় হলে যিকির স্থগিত করে প্রথমে নামায আদায় করে নিব। যে যিকির ভালো লাগে, করতে পারি। অবস্থার দাবি অনুযায়ীও যিকির করতে পারি। অভিজ্ঞ মুরুব্বির পরামর্শে যিকির করা ভালো। দৈনিক যিকিরের রুটিনটা এমন হতে পারে,

ক. একশবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। প্রথম ও শততমবারে পুরো কালিমা পড়তে পারি। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ। সাথে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পড়তে পারি।

খ. একশবার আস্তাগফিরুল্লাহ পড়তে পারি। প্রথম ও শেষবার

'আস্তাগফিরুল্লাহা রাব্বি, মিন কুল্লি যানবিন ওয়া আতুব ইলাইহি পড়তে পারি।

গ. একশবার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পড়তে পারি। প্রথমবার দুরুদে ইবরাহীম, শেষবার সাল্লাল্লাহু আলান নাবিয়্যিল উম্মিয়্যিল কারীম পড়তে পারি।

ঘ. একশবার ইসমে যাত 'আল্লাহ' বা আল্লাহু আকবার যিকির করতে পারি। শুরুতে একবার 'আল্লাহু জাল্লা জালালুহু, আম্মা নাওয়ালুহু' পড়তে পারি। শেষে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ পড়তে পারি।

দোয়ার আদাব

১. আমার দোয়া আল্লাহ তাআলা অবশ্যই কবুল করবেন, এই একিন নিয়ে দোয়া করব।

২. আল্লাহ তাআলার দিকে পরিপূর্ণ মনপ্রাণ ঢেলে দোয়া করব। দোয়ার সময় সামান্যতম গাফলত, উদাসীনতা, বেপরোয়া ভাব জাগতে দিব না।

৩. সুদিন-দুর্দিন সর্বাবস্থায় দোয়া অব্যাহত রাখব।

৪. দোয়া কবুলের ক্ষেত্রে সহায়ক উপায় অবলম্বন করে দোয়া করব। হালাল রিযিক ভক্ষণ করব, হালাল, শালীন, পরিচ্ছন্ন পোশাক পরব, আসমায়ে হুসনা ও নিজের নেকআমলের উসিলা দিয়ে দোয়া করব। আল্লাহ তাআলা প্রিয় বান্দাদের উসিলা দিয়ে দোয়া করব।

৫. দোয়া কবুলের পথে প্রতিবন্ধক হয়, এমন বিষয়গুলো পরিহার করব। হারাম ভক্ষণ করব না, হারাম পোশাক পরব না। কারো প্রতি জুলুম করব না। দোয়ার সময় অমনোযোগী থাকব না।

৬. দোয়া কবুলের সময়গুলোকে কাজে লাগাবো। রাতের শেষভাগে, ফরজ নামাযের পর, রমজানে, ইফতারের সময়, জিলহজের ৯

তারিখে, শাবানের ১৫ তারিখ রাতে, জুমার দিন, দুই ঈদের দিনে ও রাতে, ওজুর মাঝে, ওজুর শেষে, কুরআন তিলাওয়াতের পর, সফর অবস্থায়, যিকিরের মজলিসে, জুমার দিন দুই খুতবার বিরতিতে মনে মনে, জুমার দিন আসর ও মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়ে, যমযমের পানি পান করার পর মনপ্রাণ ঢেলে দোয়া করব।

৭. দোয়ার শুরুতে আল্লাহর হামদ ও সানা পাঠ করব। সূরা ফাতিহা পড়তে পারি। তারপর দুরুদ পাঠ করব, তারপর নিজের প্রয়োজন চাহিদার কথা কয়মনোবাক্যে তুলে ধরব।

৮. দোয়ার সময় কাঁদব। কান্না না এলে ভান করব।

৯. নিজের অক্ষমতা, অসহায়ত্ব তুলে ধরে দোয়া করব।

১০. দোয়াতে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করব, জান্নাতুল ফিরদাওস প্রার্থনা করব।

১১. দোয়ার পরিধি শুধু নিজের মধ্যেই সীমিত রাখব না। দোয়ার পরিসরকে ব্যাপক-বিস্তৃত করব। নিজের জন্য দোয়া করার পাশাপাশি জীবিত-মৃত সকল মুসলিমের জন্য দোয়া করব। মাতাপিতা, উস্তাদ, শাগরিদ, ভাইবোন, আত্মীয়-স্বজন, সন্তান-সন্ততি, সঙ্গীসাথীর জন্য দোয়া করব।

১২. মুনাজাতে কুরআনের দোয়াগুলোকে প্রাধান্য দিবো। হাদীসে বর্ণিত দোয়াগুলো মহব্বত নিয়ে পড়ব।

১৩. নিজের জন্য, নিজের ধনসম্পদ, নিজের সন্তানসন্ততি, নিজের ব্যবসাবাণিজ্যের ওপর বদদোয়া করব না।

১৪. দোয়ার সময় দুইহাত চেহারার সামনে রাখব।

১৫. দোয়াশেষে আমিন বলব। দুইহাত মুখে মুছব।

১৬. নিজেও অন্যের জন্য দোয়া করব, অন্যের কাছেও নিজের জন্য দোয়া চাইব।

১৭. স্থানকালপাত্রের সাথে সম্পর্কিত দোয়াগুলো নিয়মিত পাঠ করব।

শোয়ার আগে, জাগ্রত হওয়ার পর, খাবারের শুরুতে, খাবারের শেষে, মসজিদে প্রবেশের সময়, মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় মাসনুন দোয়াগুলো পড়ব।

১৮. প্রতিটি কাজের আগে জানার চেষ্টা করব, এখন কোনো মাসনুন দোয়া বা আমল আছে কি না। কিছুদিন এভাবে চেষ্টা অব্যাহত রাখলে, সব মাসনুন দোয়া মুখস্থ হয়ে যাবে। আমলেও এসে যাবে। ইন শা আল্লাহ।

তাওবার আদাব

১. প্রবৃত্তির লালসায় পড়ে গুনাহ হয়ে গেলে সাথে সাথে তাওবা করে ফেলব। তাওবার আগে তিনটি করণীয় আছে,

ক. গুনাহটা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করব।

খ. কৃতকর্মের কারণে অন্তরে গভীর অনুতাপ, অনুশোচনা জাগিয়ে তুলব।

গ. ভবিষ্যতে আর কখনো গুনাহটা করব না, এই মর্মে অবিচল সংকল্প করব।

উল্লেখ্য: গুনাহটা যদি হুকুকুল্লাহ সম্পর্কিত হয়, উপরোক্ত তিনটি কাজের পাশাপাশি আরেকটি বিষয় খেয়াল রাখব, অতীতে যদি ফরজ-ওয়াজিব কাজা থাকে, অতিসত্ত্বর সেগুলো আদায়ে সচেষ্ট হবো। অতীত জীবনে নামায, রোযা, যাকাত, হজ, কুরবানি, কাফফারা ইত্যাদি বাকি থাকলে, সেগুলো কাযা আদায় করা শুরু করে দিব।

উল্লেখ্য: গুনাহটা যদি বান্দার হক সম্পর্কিত হয়, তাহলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছ থেকে মাফ চেয়ে নিবো। লেনদেন সম্পর্কিত হলে, আদায় করে দিব। গীবত, ঠাট্টা-বিদ্রূপ, অবজ্ঞামূলক আচরণ করলে, মৌখিক মাফ চেয়ে নিব।

২. তাওবা করতে মোটেও বিলম্ব করব না। গুনাহ করার পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাওবা করে আল্লাহর কাছ থেকে গুনাহ মাফ করিয়ে নেয়ার আপ্রাণ চেষ্টা অব্যাহত রাখব।

৩. তাওবা করাকে অভ্যাসে পরিণত করব। রাতে শোয়ার আগে সারাদিনের কৃতকর্মের জন্য তাওবা করব। প্রতিদিন শোয়ার আগে চিন্তা করব, আজ সারাদিন কি কি গুনাহ করেছি।

৪. তাওবার পর নিজের চালচলন বদলে ফেলব। অতীতের পাপগুলোকে বর্তমানের ইবাদত-বন্দেগী দিয়ে ঢেকে দেয়ার চেষ্টা করব।

৫. কোনো ব্যক্তি অতীতের গুনাহ থেকে তাওবা করলে, তাকে অতীত নিয়ে খোঁচা দিব না।

৬. তাওবাকারী খেয়াল রাখবে, গুনাহটা যদি লোকজনের জানা না থাকে, সেটার কথা মানুষকে না বলা, শুধু আল্লাহর কাছেই গুনাহের স্বীকারোক্তি দেয়া। যে গুনাহ আল্লাহ গোপন রেখেছেন, বান্দার সেটাকে ফাঁস করা উচিত নয়।

৭. তাওবা করার পর আবার গুনাহ হয়ে গেলে, আবার তাওবা করে নিবো। যতবার গুনাহ হবে, ততবার তাওবা করব। তাওবা করতে পিছপা হবো না।

৮. তাওবা করে কী হবে, গুনাহ তো আবার হবে, এই ভেবে তাওবা পিছিয়ে দিব না। এখন গুনাহ করেনি, পরে একসাথে তাওবা করে নিবো, এমন বিপদজনক চিন্তা মোটেও মাথায় স্থান দিবো না।

৯. আমার এত গুনাহ, তাওবা করলেও আল্লাহ মাফ করবেন না, ঘুনাক্ষরেও এমন কুফরি চিন্তাকে প্রশ্রয় দিব না। আমি যত গুনাহই করি, আল্লাহ তাআলার ক্ষমার পরিধিকে সেটা ছাড়িয়ে যেতে পারবে না। এখন, এই মুহূর্তে তাওবা করব-আস্তাগফিরুল্লাহা ওয়া আতুবু ইলাইহি।

জুমাবারের আদাব

১. জুমার রাত ও দিনে বেশি বেশি কালিমা তাইয়িবা, ইস্তেগফার, দরুদ শরীফ পাঠ করব।

২. সূরা কাহফ তিলাওয়াত করব।

৩. ফজরের প্রথম রাকাতে সূরা সাজদা, দ্বিতীয় রাকাতে সূরা দাহর তিলাওয়াত করব।

৪. সম্ভব হলে সলাতুত তাসবীহ আদায় করব।

৫. জুমা পড়তে যাওয়ার আগে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, বিশেষ সাজসজ্জা গ্রহণ করব। গোঁফ ছেটে ফেলব। নখ কেটে ফেলব। বগলের নিচ ও নাভির নিচের পশম পরিষ্কার করে ফেলব। মিসওয়াক করব।

৬. গোসল করব।

৭. মাথায় ও দাড়িতে তেল লাগাব। খুশবু মাখব।

৮. ভালো ও পরিচ্ছন্ন পোশাক পরব।

৯. জুমার নামায পড়ার জন্য আগে আগে মসজিদে গমন করব।

১০. কোনো ওযর না থাকলে, মসজিদ কাছে হলে, পায়ে হেঁটে মসজিদে যাবো।

১১. কারো কষ্টের কারণ না হয়ে, ধীরস্থিরতা ও ভাবগাম্ভীযের সাথে মসজিদে যাবো।

১২. প্রথম কাতারে বসার চেষ্টা করা। মসজিদ ভর্তি হয়ে গেলে, অন্যকে ডিঙ্গিয়ে সামনে যাওয়ার চেষ্টা না করে, যেখানে যায়গা থাকে, বসে যাবো।

১৩. খুতবা শুরু না হয়ে গেলে, দুই রাকাত তাহিয়াতুল মুসজিদ আদায় করব।

১৪. সফে বসে থাকা ব্যক্তিকে উঠিয়ে বা সরিয়ে নিজে বসব না। নামাযি ব্যক্তির ওপর দিয়ে ডিঙ্গিয়ে সামনে যাবো না।

১৫. খতিব সাহেব আরবি খুতবার আগে স্থানীয় ভাষায় ওয়াজ-নসিহত করবেন।
১৬. খতিব সাহেব দাঁড়িয়ে খুতবা দিবেন।
১৭. খুতবা চলাকালে মুসল্লিগণ নিশ্চুপ হয়ে খতিব সাহেবের দিকে পূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ করে খুতবা শ্রবণ করবেন।
১৮. খতিব সাহেব সংক্ষিপ্ত আরবি খুতবা দিবেন।

যাকাত-সদকার আদাব

১. লোকদেখানোর ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে, শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দানসদকা করা।
২. নফল সদকা সঙ্গোপনে আদায় করব, ওয়াজিব সদকা গোপনে-প্রকাশ্যে যেভাবে ইচ্ছা আদায় করব। অন্যকে উৎসাহ দেয়ার উদ্দেশ্যে নফল সদকাও প্রকাশ্যে দেয়া যায়।
৩. হালাল উপার্জন থেকে সদকা দিবো।
৪. আল্লাহর রাস্তায় নিজের উত্তম বস্তু দান করব।
৫. দান-খয়রাতের ক্ষেত্রে গরিব আত্মীয়-স্বজনকে অন্যদের ওপর প্রাধান্য দিবো।
৬. ভিক্ষুককে ধমক দিবো না। তাওফিক থাকলে দান করব, না হলে উত্তমপন্থায় ক্ষমা চেয়ে নিবো।
৭. ভিক্ষুকের সাথে উত্তম আচরণ করব।
৮. যাকাত-সদকাকে গরিবের প্রতি অনুগ্রহ মনে করব না। এটা তার হক।
৯. যাকাত-সদকা দেয়ার পর ফেরত নিবো না।
১০. নিজের যিম্মায় অতীতের যাকাত অনাদায়ী থেকে গেলে, আগে ফরজ যাকাত আদায় করব, তারপর নফল সদকা করব।
১১. যাকাত ও ওয়াজিব সদকা শরিয়ত নির্দেশিত ব্যক্তিকে দান

করব।

১২. দানসদকা গ্রহণে অনুপযুক্ত ব্যক্তি বা মালদার ব্যক্তি সাহায্য চাইলেও দিবো না। উত্তমপন্থায় এড়িয়ে যাবো।

রমযানের আদাব

রমযানের সাধারণ আদাব

১. রমজান আসার আগে, রজব মাস থেকেই দোয়া পড়তে শুরু করব,

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبَ وَشَعْبَانَ، وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফি রজাবা ওয়া শা'বান, ওয়া বাল্লিগনা রমাদান।

হে আল্লাহ! আমাদের জন্য রজব ও শা'বান মাসে বরকত দান করুন এবং আমাদের রমজান মাস পর্যন্ত পৌঁছার তাওফিক দিন।

২. অত্যন্ত আগ্রহ-উদ্দীপনার সাথে রমজান আগমনের অপেক্ষা করব।

৩. রমযানের চাঁদ দেখা গেলে এই দোয়া পড়ব,

اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ

উচ্চারণ: আল্লাহু আকবার, আল্লাহুম্মা আহিল্লাহু 'আলাইনা বিল-আমনি ওয়াল-ঈমান, ওয়াস-সালামতি ওয়াল-ইসলাম, ওয়াত-তাওফিকি লিমা তুহিব্বু ওয়াতারদা, রব্বুনা ওয়া রব্বুকাল্লাহ।

আল্লাহ মহান। হে আল্লাহ! এই চাঁদকে আমাদের জন্য নিরাপত্তা ও ঈমান, শান্তি ও ইসলাম, এবং সেই সব কাজে তাওফিকের মাধ্যমে উদিত করুন যা আপনি পছন্দ করেন ও যার প্রতি আপনি সন্তুষ্ট। আমাদের এবং তোমার প্রতিপালক আল্লাহ।

৪. রমযানের শুরু থেকেই বেশি বেশি ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল হয়ে যাবো।

৫. অধীনস্থ ও সহকর্মীদের সাথে নম্র ব্যবহার করব, তাদের প্রতি মায়া-মমতাপূর্ণ আচরণ করব।
৬. ফরজ ইবাদতের পাশাপাশি গুরুত্বের সাথে বেশি বেশি নফল ইবাদতও করব।
৭. চারকাজ বেশি বেশি করব। কালিমা তাইয়িবা, ইস্তেগফার, জান্নাত প্রার্থনা, জাহান্নাম থেকে মুক্তি।
৮. রমযানের শেষদশকে বেশি বেশি ইবাদত-বন্দেগির প্রতি মনোযোগ দেয়া।
৯. রমযানের দিন দশকেই বেশি বেশি দোয়া করা।
প্রথম দশকে বেশি বেশি পড়ব,

رَّبِّ ٱغۡفِرۡ وَٱرۡحَمۡ وَأَنتَ خَيۡرُ ٱلرَّٰحِمِينَ

ইয়া রব, ক্ষমা করুন, রহম করুন, আপনিই শ্রেষ্ঠতম রহমকারী (মুমিনুন: ১১৮)।
দ্বিতীয় দশকে বেশি বেশি পড়ব,
আস্তাগফিরুল্লাহা রাব্বী, মিন কুল্লি যাম্বিন ওয়া আতুবু ইলাইহি।
আমার রবের কাছে সমস্ত গুনাহ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। এবং তাঁর কাছে তাওবা করছি।
তৃতীয় দশকে বেশি বেশি পড়ব,
আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুউন, তুহিব্বুল আফওয়া, ফা'ফু আন্না
হে আল্লাহ, পরম ক্ষমাশীল, ক্ষমা করতে ভালোবাসেন, আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন।
১০. বাড়তি গুরুত্ব দিয়ে কুরআন তিলাওয়াত করা।
১১. গুরুত্বের সাথে বেশি বেশি দানসদকা করা।

রোজার আদাব

১. আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই শুধু রোযা রাখব।
২. রোযা অবস্থায় গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার প্রাণপণ চেষ্টা করব।
৩. রোযা অবস্থায় বেশি বেশি নেককাজ করার চেষ্টা করব।
৪. রোযা অবস্থায় অনর্থক কথাবার্তা, গল্পগুজব থেকে বেঁচে থাকব।
৫. গুরুত্বের সাথে সাহরি খাবো। খাওয়ার ইচ্ছা না থাকলে, সাহরির নিয়তে একঢোঁক পানি হলেও পান করে নিব।
৬. এত কম খাবো না, শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে। এত বেশি খাবো না, সারাদিন পেট গুড়গুড় করে আর হাঁসফাঁস লাগে, ক্রমাগত ঢেকুর উঠতে থাকে।
৭. সাহরি বিলম্ব করে খাবো। এত বেশি বিলম্ব করব না, সাহরির সময়ই ফুরিয়ে যায়।
৮. ইফতার দ্রুত করব। এত দ্রুত নয়, সূয ডোবার আগেই খেয়ে ফেললাম।
৯. ইফতারের আগে বেশি বেশি দোয়া করব। ইফতার গ্রহণের সময় পড়তে পারি,

اللهم إني لك صمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وعلى رزقك أفطرت

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি লাকা সুমতু, ওয়া বিকা আমান্তু, ওয়া আলাইকা তাওয়াক্কালতু, ওয়া 'আলা রিযক্বিকা আফতারতু।
হে আল্লাহ! আমি তোমার জন্য রোযা রেখেছি, তোমার প্রতি ঈমান এনেছি, তোমার ওপর ভরসা করেছি, আর তোমার দেওয়া রিযিক দিয়ে ইফতার করেছি।
ইফতারে পানি পান করার পর পড়ব

ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ العُرُوقُ، وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

উচ্চারণ: যাহাবা য্যামা, ওয়াব্তাল্লাতিল উরূক, ওয়া সাবাতাল আজরু ইন শা' আল্লাহ।
পিপাসা মিটে গেছে, শিরাগুলো সিক্ত হয়েছে, আর যদি আল্লাহ চান

তবে প্রতিদান স্থির হয়েছে।

১০. সম্ভব হলে পানি দিয়ে ইফতার করব। না হলে পানি। খেজুর বেজোড় খাওয়ার চেষ্টা করব।

১১. ইফতারে যথাসম্ভব তৈলাক্ত খাবার পরিহার করব। পুষ্টিকর খাবার দিয়ে ইফতার করার চেষ্টা করব। তাজা ফলমূল, সবজি, হালকা মসলাদার খাবার, পানি, দুধ, শীতল শরবত হতে পারে। তাহলে তারাবি আদায় করতে কষ্ট হবে না। শরীরও চনমনে থাকবে।

১২. সামর্থ্য অনুযায়ী অন্যকেও ইফতার করাব।

এতকাফের আদাব

১. রমযানের শেষদশকে আগ্রহী পুরুষরা মসজিদে, নারীরা ঘরে এতেকাফ করবেন।

২. শুধু আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য এতেকাফ করব।

৩. এতেকাফের মাসায়েল ভালো করে জেনে নিবো।

৪. এতেকাফকালে বোজোড় রাতগুলোতে শবেকদর তালাশে মনোযোগী থাকব। রাতজেগে বেশি বেশি ইবাদত করার চেষ্টা করব।

৫. বেজোড় রাতগুলো বেশি বেশি পড়ব,

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নাকা 'আফু'উন তুহিব্বুল 'আফওয়া ফা'ফু 'আন্নি।

হে আল্লাহ! নিশ্চয় আপনি মার্জনাকারী, আপনি মার্জনা করতে ভালোবাসেন; তাই আমাকে ক্ষমা করে দিন।

৬. এতেকাফকালে আত্মসংশোধনের জন্য এসলাহি মজলিস ও তালিমি হালকায় শরিক হবো।

৭. এতেকাফকালে অন্যদের সুবিধা-অসুবিধার দিকে বিশেষ খেয়াল

রাখব। অন্য এতেকাফকারীদের সাথে উত্তম আচরণ করব।
৮. যথাসম্ভব কথাবার্তা কম বলব। পুরো সময়টা ইবাদত-বন্দেগিতে কাটানোর চেষ্টা করব।
৯. মসজিদকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখব।
১০. প্রয়োজনের বেশি মসজিদের বিদ্যুত, পানি, গ্যাস ব্যবহার করব না।
১১. মসজিদে বিড়িসিগারেট, গুল, জর্দা, নিসওয়ার, হুক্কা সেবন থেকে বিরত থাকব।
১২. অতীব প্রয়োজনীয় সামান মসজিদে আনব। অপ্রয়োজনীয় সামান মসজিদে আনব না।
১৩. দীনি বইপুস্তক সাথে রাখব। ফাঁকে ফাঁকে পড়ার চেষ্টা করব। বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করব।
১৪. এতেকাফকালে নিম্নোক্ত কাজগুলো করা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকব,
অশ্লীল ও বেহুদা লেখাপত্র পাঠ, ছবিযুক্ত পত্রিকা-সাময়িকি পাঠ, ইসলামবিরোধী প্রবন্ধ-নিবন্ধ পাঠ, কাল্পনিক, বানোয়াট কিসসা কাহিনি পাঠ, তাকওয়া-পরহেযগার নয়, এমন ব্যক্তির দীনি-দুনিয়াবি বক্তব্য শ্রবণ, সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার, টিভি-ইউটিউব ব্যবহার থেকে বিরত থাকব।

হজ ও ওমরার আদাব

১: হজ-ওমরায় যাওয়ার সময় শুধুই আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়ত করব। লোকদেখানো, আলহাজ হওয়ার বাসনা মন থেকে দূর করে দেব।
২. হজ-ওমরায় যাওয়ার আগে, প্রয়োজনীয় মাসায়েল-আহকাম অবশ্যই জেনে যাওয়ার চেষ্টা করব।
৩. হালাল উপার্জন থেকে হজ-ওমরা করব।

৪. যে বছর হজ ফরজ হয়ে, সে বছরই হজ করার চেষ্টা করব। শরিয়তসম্মত কারণ ছাড়া মোটেও বিলম্ব করব না।
৫. হজ-ওমরার সফরে নিয়মিত দান-সদকার আমল জারি রাখব। নিয়মিত কিছু না কিছু সদকা করার চেষ্টা করব।
৬. কথা যত কম বলা যায়, তত ভালো। বিশেষ করে এশার পর কথা সম্পূর্ণ বন্ধ রাখতে পারলে ভালো। এশার পর দেখা-সাক্ষাত, গল্প-গুজব থেকে বেঁচে থাকা কাম্য। এশার পরে অহেতুক গল্পে মজলে, তাহাজ্জুদে তো দূরের কথা, হারাম শরীফে ফজর জামাতে হাজির হওয়াও কঠিন হয়ে যায়।
৭. মানুষের আচরণে যতই কষ্ট লাগুক, রাগ উঠুক, হাসিমুখে সহ্য করে নিব। আমার সাথে দুর্ব্যবহার করলেও আমি সবার সাথে সদ্ব্যবহার করব।
৮. মনে রাখব, হজের সফরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমল হল-সবর। গরমের কষ্টে সবর, খাবারের কষ্টে সবর, হাঁটার কষ্টে সবর, মুয়াল্লিমের উদাসীন আচরণ আর খামখেয়ালিতে সবর, সহযাত্রীদের অযৌক্তিক আচরণে সবর করব।
৯. বেশি বেশি দোয়া করব। উঠতে বসতে দোয়া করব। হাঁটতে চলতে দোয়া করব। মনে মনে দোয়া করব। জীবনে যত চাওয়া আছে, সবই আল্লাহর কাছে চাইব। তাওয়াফ করতে করতে দোয়া করব। সাঈ করতে করতে দোয়া করব। হোটেল থেকে মসজিদে যেতে দোয়া করব, মসজিদ থেকে হোটেলে ফিরতে দোয়া করব। নিজের ভাষাতেই দোয়া করব। কুরআন-সুন্নাহর আরবী দোয়া মুখস্থ থাকলে সেটাও ফাঁকে ফাঁকে পড়ব।
১০. সামর্থ্য থাকলে সফরসঙ্গীদের জন্যও খরচ করব। তাদেকে এটাসেটা কিনে এনে খাওয়ানোর চেষ্টা করব।

১১. সাথীদের যথাসম্ভব খেদমত করার চেষ্টা করব। বিশেষ করে বয়স্ক হাজী সাহেবানের খেদমতে তৎপর থাকব। তাদের কিছু দরকার আছে কি না, খোঁজ রাখার চেষ্টা করব। মসজিদ থেকে আসার সময় সবার জন্য যমযম নিয়ে আসব।
১২. গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করব। বিশেষ করে চোখের গুনাহ। হোটেল থেকে বের হওয়ার আগে প্রতিজ্ঞা করে বের হবো। বদযন বা কুধারণা থেকে বেঁচে থাকার প্রাণপণ চেষ্টা করব।
১৩. নারীগণ হজের সফরে পর্দার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিব। একসাথে থাকলে লজ্জা-আড় ভেঙে যায়। তখন বেগানার সাথে কথাবার্তা, হাসিগল্পে জড়তা থাকে না। এ ব্যাপারে সতর্ক থাকব।
১৪. মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফের কোনো কিছুর সমালোচনা করব না। পছন্দ না হলে চুপ থাকব। সবর করব।
১৫. মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফ সংশ্লিষ্ট বস্তুকে সম্মান করব।
১৬. যমযম ছাড়া অন্য পানি না খাওয়ার চেষ্টা করব। যতবেশি সম্ভব যমযম পান করব।

এহরামের আদাব

১. এহরাম বাঁধার আগে গোসল করব, আতর মাখব, চুল আঁচড়ে নিব।

২. মাকরূহ ওয়াক্ত না হলে, মাথায় টুপি দিয়ে এহরামের নিয়তে দুই রাকাত নফল পড়ব। প্রথম রাকাতে সুরা কাফিরুন, দ্বিতীয় রাকাতে সুরা ইখলাস পড়ব।

৩. নামাজশেষে হজ-ওমরা কবুল হওয়ার জন্য কায়মনোবাক্যে দোয়া করব। সবিনয়ে আল্লাহ তাআলার কাছে ইখলাস চাইব।

৪. দোয়া শেষ করে পুরুষ টুপি খুলে ফেলবেন, নারী চেহারার নেকাব সরিয়ে যথাযথ পর্দা অবলম্বন করবেন। তারপর কেবলামুখি হয়ে হজ-ওমরার নিয়ত করবেন,

'ইয়া আল্লাহ, আমি শুধু আপনার সন্তুষ্টির জন্য হজ/ওমরা করছি। আমার হজ/ওমরাকে সহজ করে দিন। কবুল করে নিন।

৫. তারপর পুরো তালবিয়া তিনবার পড়ব। পুরুষরা কিছুটা উঁচু আওয়াজে পড়ব, নারীগণ মৃদু আওয়াজে পড়ব-

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ،
لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ،
إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ،
لَا شَرِيكَ لَكَ

লাব্বাইকাল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইক,

ইন্নাল হামদা ওয়ান্-নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক, লা শারীকা লাক।

আমি হাজির, হে আল্লাহ! আমি হাজির। আমি হাজির, আপনার কোনো শরীক নেই, আমি হাজির। নিশ্চয় সকল প্রশংসা, সকল নিয়ামত এবং সমগ্র রাজত্ব আপনারই। আপনার কোনো শরীক নেই।

৬. এবার আমি 'মুহরিম' হয়ে গেছি। মুহরিম মানে, এহরাম বাঁধা ব্যক্তি। এখন থেকে সচক্ষে কাবাশরীফ দেখার আগ পযন্ত তালবিয়া পাঠ করে যাব। সারাক্ষণ যতবেশি সম্ভব তালবিয়া পাঠ করতে থাকব।

বায়তুল্লাহতে প্রবেশের আদাব

১. হোটেটে পৌঁছে ব্যাগ-ব্যাগেজ রেখে ওজু-গোসল করে ধীরেসুস্থে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে।

২. আল্লাহ তাআলার সম্মান, মযাদা, বড়ত্ব, মহত্বের কথা ভাবতে ভাবতে হোটেল থেকে রওয়ানা দিব। মুখে থাকবে তালবিয়া।

৩. সম্ভব হলে বাবুস সালাম দিয়ে প্রবেশ করব। অন্য দরজা দিয়ে হারাম শরীফে প্রবেশ করলেও কোনো সমস্যা নেই।

৪. মসজিদুল হারামে প্রবেশের সময় এই দোয়া পড়ব,

بِسْمِ اللَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، رَبِّ اغْفِرْلِيْ ذُنُوْبِيْ وَافْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

"বিসমিল্লাহি, ওয়াস্-সালাতু ওয়াস্-সালামু 'আলা রাসূলিল্লাহ। রাব্বিগফিরলী ওয়াফতাহ লী আবওয়াবা রাহমাতিক।

আল্লাহর নামে শুরু করছি। আল্লাহর রাসূলের ওপর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক। ইয়া রব, আমার পাপরাশি ক্ষমা করুন, এবং আমার জন্য আপনার রহমতের দরজাগুলো খুলে দিন।

৫. মসজিদে প্রবেশের সময় এতেকাফের নিয়ত করব।

৬. হাঁটতে হাঁটতে তালবিয়া পড়তে থাকব। ফাঁকে ফাঁকে দুরুদ শরীফও পড়তে পারি।

৭. কাবা শরীফ প্রথম দেখার মুহূর্তটি অত্যন্ত বরকতময়, এ সময় দোয়া কবুল হয়। মসজিদুল হারামে আসার আগেই কাবা শরীফ দেখার পর কী দোয়া করব, সেটা ঠিক করে রাখব।

৭. কাবা শরীফ দেখার পর তালবিয়া পাঠ বন্ধ করে তিনবার আল্লাহু আকবার বলব, তারপর তিনবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলব। তারপর দুরুদ পাঠ করব।

৮. তারপর এই দোয়া পড়তে পারি,

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ، فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلاَمِ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা আনতাস সালামু ওয়া মিনকাস সালাম, ফাহাইয়্যিনা রাব্বানা বিসসালাম।

অর্থ: "হে আল্লাহ! আপনিই সালাম (শান্তির আধার), আপনার পক্ষ থেকেই শান্তি আসে। অতএব, হে আমাদের রব! আমাদের শান্তির সাথে বাঁচিয়ে রাখুন।

২. পাশাপাশি কাবাঘরের সম্মান বৃদ্ধির জন্য দোয়া করতে পারি,

اللَّهُمَّ زِدْ هَذَا الْبَيْتَ تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وَتَكْرِيمًا وَمَهَابَةً، وَزِدْ مَنْ شَرَّفَهُ وَكَرَّمَهُ مِمَّنْ حَجَّهُ أَوِ اعْتَمَرَهُ تَشْرِيفًا وَتَكْرِيمًا وَتَعْظِيمًا وَبِرًّا

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা যিদ হাজাল বাইতা তাশরিফান ওয়া তা'জিমান ওয়া তাকরিমান ওয়া মাহাবাতান; ওয়া যিদ মান শাররাফাহু, ওয়া

কাররামাহু মিম্মান হাজ্জাহু আওয়ি'তামারাহু তাশরিফান ওয়া তাকরিমান ওয়া তাজিমান।
অর্থ: "হে আল্লাহ! এই ঘরের সম্মান, মর্যাদা, কদর ও ভীতি বাড়িয়ে দিন। আর যে ব্যক্তি এই ঘরকে সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছে—হজ বা উমরার মাধ্যমে—তারও সম্মান, মর্যাদা, কদর ও পুণ্য বাড়িয়ে দিন।

৩. তারপর এই দোয়া পড়তে পারি,

اللهُمَّ إِنِّيْ أَسْئَلُكَ رِضاكَ والجنَّةَ وَأَعُوْذُ بك من غَضَبِكَ والنارِ

আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা রিদাকা ওয়াল জান্নাতা ওয়া আউযু বিকা মিন গাদাবিকা ওয়ান নার।

ইয়া আল্লাহ, আপনার সন্তুষ্টি ও জান্নাত প্রার্থনা করছি। আপনার অসন্তুষ্টি ও জাহান্নাম থেকে পানাহ চাইছি।

বায়তুল্লাহতে প্রবেশের আদাব

১. হোটেটে পৌঁছে ব্যাগ-ব্যাগেজ রেখে ওজু-গোসল করে ধীরেসুস্থে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে।

২. আল্লাহ তাআলার সম্মান, মযাদা, বড়ত্ব, মহত্বের কথা ভাবতে ভাবতে হোটেল থেকে রওয়ানা দিব। মুখে থাকবে তালবিয়া।

৩. সম্ভব হলে বাবুস সালাম দিয়ে প্রবেশ করব। অন্য দরজা দিয়ে হারাম শরীফে প্রবেশ করলেও কোনো সমস্যা নেই।

৪. মসজিদুল হারামে প্রবেশের সময় এই দোয়া পড়ব,

بِسْمِ اللَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، رَبِّ
اغْفِرْلِيْ ذُنُوْبِيْ وَافْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

"বিসমিল্লাহি, ওয়াস্-সালাতু ওয়াস্-সালামু 'আলা রাসূলিল্লাহ। রাব্বিগফিরলী ওয়াফতাহ্ লী আবওয়াবা রাহমাতিক।

আল্লাহর নামে শুরু করছি। আল্লাহর রাসূলের ওপর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক। ইয়া রব, আমার পাপরাশি ক্ষমা করুন, এবং আমার জন্য আপনার রহমতের দরজাগুলো খুলে দিন।

৫. মসজিদে প্রবেশের সময় এতেকাফের নিয়ত করব।

৬. হাঁটতে হাঁটতে তালবিয়া পড়তে থাকব। ফাঁকে ফাঁকে দুরুদ শরীফও পড়তে পারি।

৭. কাবা শরীফ প্রথম দেখার মুহূর্তটি অত্যন্ত বরকতময়, এ সময় দোয়া কবুল হয়। মসজিদুল হারামে আসার আগেই কাবা শরীফ দেখার পর কী দোয়া করব, সেটা ঠিক করে রাখব।

৭. কাবা শরীফ দেখার পর তালবিয়া পাঠ বন্ধ করে তিনবার আল্লাহু আকবার বলব, তারপর তিনবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলব। তারপর দুরুদ পাঠ করব।

৮. তারপর এই দোয়া পড়তে পারি,

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা আনতাস সালামু ওয়া মিনকাস সালাম, ফাহাইয়্যিনা রাব্বানা বিসসালাম।

অর্থ: "হে আল্লাহ! আপনিই সালাম (শান্তির আধার), আপনার পক্ষ থেকেই শান্তি আসে। অতএব, হে আমাদের রব! আমাদের শান্তির সাথে বাঁচিয়ে রাখুন।

২. পাশাপাশি কাবাঘরের সম্মান বৃদ্ধির জন্য দোয়া করতে পারি,

اللَّهُمَّ زِدْ هَذَا الْبَيْتَ تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وَتَكْرِيمًا وَمَهَابَةً، وَزِدْ مَنْ شَرَّفَهُ وَكَرَّمَهُ مِمَّنْ حَجَّهُ أَوِ اعْتَمَرَهُ تَشْرِيفًا وَتَكْرِيمًا وَتَعْظِيمًا وَبِرًّا

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা যিদ হাজাল বাইতা তাশরিফান ওয়া তা'জিমান ওয়া তাকরিমান ওয়া মাহাবাতান; ওয়া যিদ মান শাররাফাহু, ওয়া কাররামাহু মিম্মান হাজ্জাহু আওয়ি'তামারাহু তাশরিফান ওয়া তাকরিমান ওয়া তাজিমান।

অর্থ: "হে আল্লাহ! এই ঘরের সম্মান, মর্যাদা, কদর ও ভীতি বাড়িয়ে দিন। আর যে ব্যক্তি এই ঘরকে সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছে—হজ বা উমরার মাধ্যমে—তারও সম্মান, মর্যাদা, কদর ও পুণ্য বাড়িয়ে দিন।

৩. তারপর এই দোয়া পড়তে পারি,

اللهُمَّ إِنِّيْ أَسْئَلُكَ رِضاكَ والجنَّةَ وَأَعُوْذُ بك من غَضَبِكَ والنارِ

আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা রিদাকা ওয়াল জান্নাতা ওয়া আউযু বিকা মিন গাদাবিকা ওয়ান নার।

ইয়া আল্লাহ, আপনার সন্তুষ্টি ও জান্নাত প্রার্থনা করছি। আপনার অসন্তুষ্টি ও জাহান্নাম থেকে পানাহ চাইছি।

তাওয়াফের আদাব

১. তাওয়াফের নিয়ত করব। ইয়া আল্লাহ, আমি শুধু আপনার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হজ/ওমরার জন্য সাত চক্কর তাওয়াফের নিয়ত করছি। আয় আল্লাহ, আমার জন্য তাওয়াফকে সহজ করে দিন। আমার তাওয়াফ কবুল করে নিন।

২. তাওয়াফের সময় অত্যন্ত বিনয়নম্র থাকব। তাওয়াফের সময় কাউকে কষ্ট দিব না। ধাক্কা দিব না। উঁচু আওয়াজে কিছু পড়ব না। দলবেঁধে হাঁটলে অন্যের কষ্ট হলে, আলাদা হয়ে হাঁটব।

২. তাওয়াফের উদ্দেশ্যে হোটেল থেকে বের হওয়ার সময় হোটেলের নাম-ঠিকানা, কার্ড, ফোন নাম্বার গুরুত্বের সাথে সংগ্রহ করব। সাথে রাখব। প্রথমবার তাওয়াফের সময় দলছুট হয়ে গেলে, কোথায় থাকব, সেটা মুয়াল্লিমের সাথে আগে থেকে ঠিক করে রাখব।

৩. হজ/ওমরার তাওয়াফের শুরুতে ইজতিবা করব। ইজতিবা মানে, ডান কাঁধ খোলা রেখে এহরাম পরব। ডান বগলের নিচ দিয়ে এহরামের কাপড় পেঁচিয়ে বাম কাঁধে রাখব।

৪. হজ/ওমরার তাওয়াফে প্রথম তিন চক্করে সম্ভব হলে রমল করব। রমল মানে একটু দ্রুতগতিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বীরদর্পে হাঁটা। ভীড়ের জন্য রমল করতে না পারলে স্বাভাবিকভাবে হাঁটব।

৫. তাওয়াফের সময় সম্ভব হলে হাজরে আসওয়াদ চুমু দিব। সম্ভব না হলে থেকে ইসতিলাম করব। ইসতিলাম মানে হাত দিয়ে হাজরে আসওয়াদ ছুঁয়ে হাতে চুমু খাওয়া। কাছে যেতে না পারলে দূর

থেকে হাত দিয়ে ইশারা করে হাতে চুমু খাব। ইসতিলামের সময় ইচ্ছা হলে এই দোয়া পড়তে পারি,

بِسْمِ اللهِ اللهُ أَكْبَرُ وَلِلهِ الحَمْدُ وَالصَّلاةُ والسَّلامُ على رَسُوْلِ اللهِ، اللّٰهُمَّ إِيْمَانًا بِكَ وَتَصْدِيْقًا بِكِتَابِكَ وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ واتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ.

বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার, ওয়া লিল্লাহিল হামদ, ওয়াসসলাতু ওয়াসসালামু আলা রাসুলিল্লাহ. আল্লাহুম্মা ঈমানাম বিকা ওয়া তাসদীকাম বিকিতাবিকা ওয়া ওয়াফা-আম বিআহদিকা, ওয়াত্তিবা-আন লিসুন্নাতি নাবিয়্যিকা মুহাম্মাদিন আলাইহিস সলাতু ওয়াসসালাম.

আল্লাহর নামে শুরু করছি। আল্লাহ মহান। আল্লাহর জন্যই সমস্ত প্রশংসা। রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসুলের ওপর। ইয়া আল্লাহ, আপনার প্রতি ঈমান এনে, আপনার নাযিলকৃত কিতাব বিশ্বাস করে, আপনার সাথে কৃত ওয়াদা পূরণ করে, আপনার নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নতের অনুসরণ করে আমি আপনার দরবারে হাজির হয়েছি।

৬. তাওয়াফের সময় হাঁটতে হাঁটতে মনেরমতো বিভিন্ন দোয়ার পাশাপাশি এই জিকিরও করতে পারি,

سُبْحَانَ اللهِ والحَمْدُ لِلهِ وَلا إِلهَ إِلّا اللهُ واللهُ أَكْبَرُ ولا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إلا بِاللهِ

সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার। ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুউয়াতা ইল্লা বিল্লাহ.

আল্লাহ তাআলা সমস্ত দোষত্রুটি-অসম্পূর্ণতা থেকে মুক্ত। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আল্লাহ ছাড়া আর কোনো প্রকৃত ইলাহ নেই। আল্লাহ সবচেয়ে বড়। আল্লাহ ছাড়া আর কোনো শক্তি নেই, সহায় নেই।

৭. রুকনে ইয়ামানিতে পৌঁছে দুই হাতে বা শুধু ডানহাতে কোনাটা ছোঁয়ার চেষ্টা করব। হাতে চুমু দিব না। হাত দিয়ে ছোঁয়া সম্ভব না হলে স্বাভাবিকভাবে হেঁটে চলে যাবো। রুকনে ইয়ামানির দিকে ইশারা করার দরকার নেই। রুকনে ইয়ামানিতে পৌঁছে এই দোয়া পড়তে পারি,

اللهُمَّ إِنِّيْ أَسْئَلُكَ العَفْوَ والْعَافِيَةَ في الدُّنْيَا والآخِرةِ.

আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল আফওয়া ওয়াল আফিয়াতা ফিদ-দুনইয়া ওয়াল আখিরাহ।

ইয়া আল্লাহ, আমি আপনার কাছে দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষমা ও সুস্থতা কামনা করছি।

৮. রুকনে ইয়ামানি থেকে হাজরে আসওয়াদে পৌঁছার আগ পযন্ত নিচের দোয়া পড়তে থাকব। নবীজি সা. পড়তেন,

رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلْـَٔاخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ

ইয়া রব, আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করুন, আখেরাতেও কল্যাণ দান করুন। আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করুন (বাকারাঃ ২০১)।

৯. সাত চক্কর শেষ হলে এহরামের কাপড় ঠিক করে পরব। ডানকাঁধ ঢেখে স্বাভাবিকভাবে চাদর পরিধানের মতো পুরো শরীর ঢেকে পরব।

১০. তারপর মাকামে ইবরাহীমের পেছনে গিয়ে দুই রাকাত তাওয়াফের নামাজ পড়ব। মাকামে ইবরাহীমের পেছনে জায়গা না পেলে হারামের যে কোনো জায়গায় নামাজ আদায় করলে হয়ে যাবে। প্রথম রাকাতে সুরা কাফিরুন, দ্বিতীয় রাকাতে সুরা ইখলাস পড়তে পারি।

১১. নামাজ শেষ করে তৃপ্তি ভরে যমযম পান করব। গরম লাগলে নিজের শরীরে যমযম ছিটিয়ে দিব। যমযম পানের আগে পরে এই দোয়া পড়ব,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا وَاسِعًا، وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ

আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা ‘ইলমান নাফি‘আ, ওয়া রিযকান ওয়াসি‘আ, ওয়া শিফাআ’আম মিন কুল্লি দা।
হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে উপকারী জ্ঞান, প্রশস্ত রিযিক এবং সকল রোগ থেকে আরোগ্য কামনা করছি।

সাফা-মারওয়াতে সাঈর আদাব

১. সাঈর জন্য যাওয়ার সময় বাইতুল্লাহকে ইসতিলাম করে বাবুস সাফা ধরে সাফার দিকে রওনা হবো।

২. সাফায় ওঠার পর বাইতুল্লাহর দিকে মুখ করে সাঈর নিয়ত করব। ইয়া আল্লাহ, আমি শুধু আপনার সন্তুষ্টির জন্য সাঈর নিয়ত করছি। আপনি আমার জন্য সাঈকে সহজ করে দিন। আমার সাঈকে কবুল করে নিন।

৩. দোয়ার মতো করে হাত তুলে তিনবার আল্লাহু আকবার, তিনবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়তে পারি। তারপর দরুদ শরিফ পড়ে এই আয়াত পড়তে পারি,

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ

নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত (বাকারাঃ ১৫৮)।

৪. সাফা-মারওয়াতে দাঁড়িয়ে কেবলামুখি হয়ে এই দোয়াটি পড়তে পারি,

اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ

আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু, ওয়া লাহুল হামদু, ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু

ওয়াহদাহু, আনজাযা ওয়াদাহু, ওয়া নাসারা আবদাহু, ওয়া হাযামাল আহযাবা ওয়াহদাহু।

আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই, প্রশংসাও তাঁরই। তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনি একাই তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং একাই শত্রুদলকে পরাজিত করেছেন।

৫. সাঈ শুরু করার পর মাথার ওপরে সবুজ বাতি শুরু হলে, পুরুষরা হালকা দৌড়ের ভঙ্গিতে ছুটবেন। নারীগণ স্বাভাবিক গতিতে হাঁটবেন। সবুজ বাতির নিচে থাকাকালে এই দোয়া পড়তে পারি,

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ

রাব্বিগফির ওয়ারহাম, ইন্নাকা আনতাল আআজ্জু ওয়া আকরাম।

হে আমার রব! ক্ষমা করুন ও দয়া করুন। নিশ্চয়ই আপনি পরাক্রমশালী, মহাসম্মানিত।

৬. তাওয়াফে প্রচণ্ড ভীড় থাকলেও সাঈতে ভীড় কিছুটা কম থাকে। স্বাভাবিকভাবে হাঁটা যায়। হাঁটতে হাঁটতে মনখুলে দোয়া করব। আমার যত চাওয়া আছে, সব আল্লাহ তাআলার কছে খুলে বলব।

মিনা, আরাফা, মুযদালিফার আদাব

১. জিলহজের আট তারিখে জোহরের আগেই মিনায় পৌঁছে-জোহর, আসর, মাগরিব, এশা, নয় জিলহজের ফজর মিনাপ্রান্তরে আদায় করব।

২. নয় জিলহজ ফজর আদায় করে আরাফাতের দিকে রওনা হয়ে যাব।
৩. আরাফাতের ময়দানে দোয়া, জিকির, দুরুদ, তাওবা, ইস্তেগফার করতে থাকব। নবীজি সা. আরাফাতের ময়দানে দীর্ঘ দীর্ঘ দোয়া করেছেন। কেবলামুখি হয়ে যতবেশি সম্ভব দোয়া করে যাব।

৪. আরাফা থেকে মুযদালিফায় যাওয়ার সময় দ্রুতগতিতে হাঁটার চেষ্টা করব।

৫. মুযদালিফায় রাতে অবস্থান করব।

৬. জামারাতে নিক্ষেপ করার জন্য মুযদালিফা থেকে পাথর সংগ্রহ করে নিব।

৭. মুযদালিফা থেকে মিনায় ফিরে আসার সময় 'ওয়াদি মুহাসসার' নামক জায়গায় না থেকে ধীরে ধীরে সেস্থান অতিক্রম করে যাব।

৮. হজের জন্য নির্ধারিত স্থানগুলোর প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করব।

৯. জামারায় পাথর নিক্ষেপকালে অন্যদের কষ্ট দিব না।

১০. নিক্ষেপের আগেই কোনো নুড়ি হাত থেকে পড়ে গেলে সেটা না উঠানো। এজন্য সাবধাণতাবশত কিছু নুড়ি বেশি সংগ্রহ করে রাখব।

মদীনা মুনাওয়ারার আদাব

১. মদীনায় যাওয়ার আগে নিয়ত করব, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওজা যেয়ারতে যাচ্ছি।

২. মদীনার প্রতি মহব্বত ও সম্মান নিয়ে রওয়ানা হবো। যতদিন মদীনায় অবস্থান করি, এই অনুভূতি ধরে রাখব।

৩. মদীনা শরীফে যাওয়ার পথে পরম দরদ আর মহব্বতের সাথে দুরুদ শরীফ পাঠ করতে থাকব।

৪. মদীনায় পৌঁছে হোটেলে ব্যাগ-ব্যাগেজজ রেখে, গোসল বা ওজু করে, উত্তম পোশাক পরে, আতর মেখে মসজিদে নববীতে যাবো।

৫. মসজিদের প্রবেশের সুন্নত ও আদাবগুলো পরম মমতায় আদায় করব।

৬. নবীজির রওজার সামনে সম্ভব হলে, কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে সালাম পেশ করব। তারপর আবু বকর, তারপর ওমরের প্রতি সালাম পেশ করব।

৭. নবীজির রওজা যেয়ারত করার সময় আদব বজায় রাখব। আওয়াজ নিচু রাখব। কারো আচরণে রাগ করব না, সবর করব। প্রতিদিন অন্তত একবার হলেও নবীজির রওজায় সরাসরি হাজির হয়ে সালাম পেশ করার চেষ্টা করব।

৮. মদীনায় অবস্থানকালে বেশি বেশি দুরুদ পাঠ করব। জান্নাতুল বাকি যেয়ারত করব।

৯. শনিবারে মসজিদে নববীতে ফজর পড়ে সম্ভব হলে পায়ে হেঁটে, কষ্ট লাগলে গাড়িতে চড়ে মসজিদে কুবায় যেতে পারি। সেখানে ইশরাক আদায় করে ফিরে আসতে পারি। নবীজি তাই করতেন।

কুরবানির আদাব

১. শুধুই আল্লাহ তাআলাকে রাজিখুশি করার জন্য কুরবানি করব; লোকদেখানোর জন্য নয়।

২. কুরবানি ওয়াজিব হওয়ার পরিমাণ টাকা না থাকলেও, সম্ভব হলে কুরবানি দেয়া ভাল।

৩. কুরবানির জন্তুটা যেন মোটাতাজা, সুন্দর, উন্নত জাতের হয়, সেদিকটা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করব।

৪. সামর্থ্য থাকলে নবীজির নামে, সাহাবায়ে কেরামের নামে, আউলিয়ায়ে কেরামের নামে এক শরিক বা আস্ত জন্তু নফল কুরবানি করতে পারি।

৫. জিলহজের ১০ তারিখেই কুরবানি করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করব। একান্ত অপারগ হলে দ্বিতীয় বা নিতান্ত বাধ্য হলে তৃতীয় দিন কুরবানি করতে পারি।

৬. কুরআনির জন্তুর যেন কোনো কষ্ট না হয়, সেজন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করব। আগে কেনা হয়ে গেলে, নিয়মিত পরিচর্যা করব। ঘাসলতা খাওয়াব। জবেহ করার সময় যতটা সম্ভব কম কষ্ট দেয়ার চেষ্টা করব। দ্রুত আর কোমল হাতে বেঁধে ফেলব। বেঁধে ফেলার পর একটুও দেরি না করে তাড়াতাড়ি জবেহ করে ফেলব।

৭. নিজের কুরবানি নিজেই জবেহ করার চেষ্টা করব। একান্ত অপারগ হলে অন্য কাউকে দায়িত্ব দিব। অন্য কেউ জবেহ করলে, নিজের সেখানে উপস্থিত থাকব।

৮. ছুরি ভালো করে ধার দিয়ে নিব। কুরবানির পশুর সামনে ছুরি ধার দিব না। আড়ালে গিয়ে করব। জবেহ করার আগে এই দোয়া পড়ব,

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا
وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ

وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُۥ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ، اللهُمَّ مِنْكَ ولَكَ.

৯. উপরোক্ত দোয়া পড়ার পর বিসমিল্লাহ আল্লাহু আকবার বলে জবেহ করব। জবেহ করার সময় শ্বাসনালি, খাদ্যনালি, দুই শাহরগ কাটা গেছে কি না খেয়াল রাখব। এসব নালি কাটা না গেলে জবেহ সহিহ হবে না।

১০. একটি কুরবানির জন্তুর সামনে আরেকটিকে জবেহ করব না।

১১. উটকে দাঁড়ানো অবস্থায় নহর (জবেহ) করা সুন্নত। নহরের পদ্ধতি হল, সামনের একটি পা বেঁধে বাকি তিনপায়ের ওপর দাঁড় করিয়ে রেখে, বিসমিল্লাহ আল্লাহু আকবার বলে জবেহ করব। জবেহ করার পদ্ধতি হল, ধারালো ছুরি দিয়ে গর্দানের নিচের অংশে সিনার লাগোয়া স্থানে ছুরি ছালিয়ে গলা কেটে রক্ত বেরিয়ে যাওয়ার পথ করে দেয়া। তাহলে উট একপাশে ঢলে পড়ে যাবে।

১২. উট ছাড়া বাকি জন্তুগুলোকে কোমলভাবে বামপাশে কাত করে, মুখটা কেবলামুখি করে জবেহ করব। জবেহ করার পরপর রাশির বাঁধন খুলে দেব যাতে রুহ বেরিয়ে যাওয়ার সময় পাঁ ছুঁড়তে পারে। চার পা উন্মুক্তভাবে ছুঁড়তে পারলে শিরা-উপশিরা থেকে ভালোভাবে রক্ত বেরিয়ে যাবে।

১৩. ওজু অবস্থায় জবেহ করার চেষ্টা করব। ডান হাতে জবেহ করব। জবেহ করার সময় ঠিকমতো রগগুলো কাটা

গেছে কি না সেদিকে লক্ষ্য রাখব। ছুরি সাবধানে চালাব। সতর্ক থাকব, মাথা যেন শরীর থেকে আলাদা না হয়ে যায়।

১৪. দিনে জবেহ করার চেষ্টা করব। বিশেষ কারণ থাকলে রাতে জবেহ করা জায়েজ আছে। সেক্ষেত্রে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা রাখতে হবে।

১৪. ছামড়া ছিলার আগে রূহ পুরোপুরি বেরিয়ে যাওয়ার অপেক্ষা করব।

১৫. কুরবানির গোশত তিনভাগ করতে পারি। একভার নিজের জন্য, আরেকভাগ আত্মীয়-স্বজনের জন্য আরেকভাগ ফকির-মিসকিনের জন্য। হাঁ, তিনভাগ করা জরুরি নয়। কুরবানির সব গোশত নিজেরা খেতে পারবে।

দুই ঈদের আদাব

১. ঈদের দিন আগে আগে জেগে তাহাজ্জুদ পড়ার চেষ্টা করব। ফজরের নামাজ মসজিদে জামাতের সাথে পড়ার চেষ্টা করব।

২. ঈদের দিন বাড়তি গুরুত্বের সাথে পাকসাফ হবো। চুল-নখ কাটাব। গোফ ছেটে ফেলব। বগল ও নাভির নিজের পশম কেটে ফেলব। মিসওয়াক করব। ভালভাবে গোসল করব।

৩. নতুন পোশাক পরতে পারলে ভালো। না হলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোশাক পরব। আতর মাখব। নারীগণও ঘরে উত্তম পোশাক পরবেন। আতরখুশমু মাখবেন। নারীগণ ঘরের বাইরে বেড়াতে যাওয়ার সময় সুগন্ধি এড়িয়ে চলবেন।

৪. ঈদুল ফিতরে ঈদগাহে যাওয়ার আগে বেজোড় সংখ্যায় খেজুর খেয়ে যাবো। খেজুর না থাকলে মিষ্টি কিছু খেয়ে যাবো। ঈদুর আজহায় কিছু না খেয়ে খালিমুখে ঈদগাহে যাবো। সম্ভব হলে কুরবানির গোশত দিয়ে উপবাস ভাঙব।

৫. ঈদুল ফিতরে ঈদগাহে যাওয়ার আগে সাদাকাতুল ফিতর আদায় করে ফেলব। শরিয়তসম্মত ওজরের কারণে রমজানে রোজা রাখতে না পারলে, ভবিষ্যতে কাযা আদায় করার মতো অবস্থা শারীরিক অবস্থা না থাকলে, ঈদগাহে যাওয়ার আগে রোজার ফিদইয়া আদায় করে যাওয়ার চেষ্টা করব। ঈদগাহে যাওয়ার আগে সদকাতুল ফিতর বা ফিদইয়া আদায় করতে না পারলে, ঈদগাহ থেকে ফিরে যত দ্রুত সম্ভব আদায় করে দিব। বিলম্বের জন্য তাওবা-ইস্তেগফার করব।

৬. পায়ে হেঁটে ঈদগাহে যাওয়ার চেষ্টা করব। অসুস্থতা, বার্ধক্য বা দূরত্বের কারণে গাড়িতে গেলে সমস্যা নেই।

৭. ঈদগাহে পৌঁছা পর্যন্ত এই দোয়া পড়তে থাকব,

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لا إلهَ إلا اللهُ واللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ ولِلهِ الحَمْدُ

৮. ঈদুল ফিতরের দিন তাকবীর কিছুটা নিচু আওয়াজে, ঈদুল ফিতরের দিন কিছুটা উঁচু আওয়াজে তাকবীর দিব।

৯. ঈদগাহে যাওয়ার সময় এক রাস্তা, ফেরার সময় ভিন্ন রাস্তা অবলম্বন করার চেষ্টা করব। সমস্যা থাকলে এক রাস্তাতেই আসা-যাওয়া করলে কোনো সমস্যা নেই।

১০. ঈদের দিন পরিবার-পরিজনের জন্য সাধ্যমতো হাতখুলে খরচ করা উত্তম।

১১. বিশুদ্ধ আকীদাসমম্প ইমামের পেছনে ঈদের নামাজ আদায় করার চেষ্টা করব। ইমাম সাহেবে নসিহত মনোযোগ দিয়ে শুনব। সে অনুযায়ী আমল করব।

১২. সালাম ফিরিয়ে উঠে চলে আসব না। মনোযোগ দিয়ে দুই খুতবা শুনব। খুতবা চলাকালে কথা বলব না।

১৩. ঈদের নামাজের পর নিজের জন্য, পরিবারের জন্য, মুসলিম উম্মাহর জন্য রহমত, বরকত ও মাগফিরাতের দোয়া করব।

১৪. ঈদের দিন আত্মীয়-স্বজনের সাথে দেখা করব। মা-বাবা, ভাইবোনের খোঁজখবর করব। মুমিন ভাইয়ের সাথে দেখা হলে বলব,

تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ صَالِحَ الأَعْمَال

আল্লাহ্ তাআলা আমার ও আপনার উত্তম আমলগুলো কবুল করে নিন।

তৃতীয় অধ্যায়

মুআশারা

সামাজিক আচার-আচরণে যদি আদবলেহাজের চর্চা থাকে, তাহলে ব্যক্তির আখলাক, চিন্তাভাবনা, লেনদেনে এর প্রভাব পড়ে। এর মাধ্যমে আমাদের ব্যক্তিজীবন সুখের হয়। পারস্পরিক সম্পর্ক গভীর হয়। পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় হয়।

মাতাপিতার আদাব

১. মনপ্রাণ দিয়ে মাতাপিতার কথা শুনব, তাদের অনুগত থাকব। মাতাপিতা শরিয়তবিরোধী কিছু করতে বললে, সে হুকুম তামিল করা যাবে না। মাতাপিতা শরিয়তের আবশ্যক বিধান পালন করতে নিষেধ করলে, সেটা শোনা যাবে না।

২. মাতাপিতার খেদমত করব।

৩. মাতাপিতার সাথে নম্রভদ্র আচরণ করব। সম্মান দিয়ে কথা বলব। রাগতস্বরে, উঁচু আওয়াজে কথা বলব না।

৪. মাতাপিতাকে নাম ধরে ডাকব না।

৫. মাতাপিতা কিছু চাইলে, সামর্থ থাকলে এনে দিব।

৬. মাতাপিতার জন্য খরচ করাকে বোঝা মনে করব না। মনপ্রাণ খুলে তাদের জন্য খরচ করব।

৭. মাতাপিতার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধবের সাথে সুন্দর আচরণ করব।

৮. কোনো কারণে মাতাপিতা আমার প্রতি রাগ করলে, ক্ষমা চেয়ে তাদের রাগ দূর করব।

৯. মাতাপিতার জন্য সবসময় দোয়া করব,

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

হে আমার প্রতিপালক! আপনি তাদের প্রতি দয়া করুন, যেমন করে তারা আমাকে ছোটবেলায় লালন-পালন করেছেন।

১০. মাতাপিতাকে কখনো গালি দিব না, কটু কথা বলব না, রাগ দেখাব না, অবজ্ঞা করব না, তর্ক করব না। আমার কারণে মাতাপিতাকে অন্যের গালি খেতে হয়, এমন কাজ করব না।

১১. মাতাপিতা ইন্তেকাল করলে নিয়মিত তাদের মাগফিরাতের জন্য দোয়া করব। তাদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখব।

১২. শরিয়তের সীমায় থেকে কবরবাসী মাতাপিতার জন্য নিয়মিত

ইসালে সওয়াব করতে থাকব।

১৩. কবরবাসী মাতাপিতার নামায কাজা থেকে গেলে, সামর্থ থাকলে হিসাব করে ফিদয়া আদায় করে দিব।

১৪. মাতাপিতার অনাদায়ী ঋণ থাকলে, আদায় করে দেয়ার চেষ্টা করব।

শিক্ষকের আদাব

১. শিক্ষকগণ আত্মিক পিতার মতো। তাদেরকে যথাসম্ভব সম্মান করব।

২. শিক্ষক ঘরে প্রবেশ করলে, আমি বসা থাকলে সম্মানার্থে উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানাব।

৩. শিক্ষকের সাথে দেখা হলে সালাম দিয়ে মুসাফাহা করব।

৪. শিক্ষকের আসনে বসব না।

৫. শিক্ষকের উপস্থিতিতে অন্য কোনো দিকে মনোযোগ দিবো না। শিক্ষকের সামনে বসে এদিক-সেদিক তাকাব না।

৬. শিক্ষকের আদেশ পালন করব।

৭. শিক্ষকের সাথে হাঁটলে তার আগে যাবো না।

৮. শিক্ষক কোনো সমস্যায় পড়লে, সাধ্যমতো সাহায্যে এগিয়ে যাবো।

৯. শিক্ষকের জুতো সোজা করে রাখব।

১০. শিক্ষককে নাম ধরে ডাকব না। সম্মানসূচক উপাধিতে সম্বোধন করব, হুজুর, ওস্তাদজি, স্যার ইত্যাদি হতে পারে।

১১. শিক্ষকের কোনো অভ্যাস পছন্দ না হলে, সহ্য করে নেব। সামান্য কারণে শিক্ষক পরিবর্তন করব না।

১২. শিক্ষকের গীবত করব না। শিক্ষককে মন্দ উপাধিতে ডাকব না।

১৩. আনুষ্ঠানিক পড়াশোনা শেষ হয়ে গেলেও, ছাত্রজীবনের মতোই

আজো শিক্ষককে সম্মান করব।

১৪. শিক্ষক আমার প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত হলে, তার জন্য উত্তম বসার জায়গা করে দেব। সবচেয়ে সম্মানজনক আসনে তাকে বসাব।

শাগরিদের প্রতি আদাব

১. ছাত্রের প্রতি স্নেহ-মমতা পোষণ করব।

২. ছাত্রের সাথে নরমকোমল আচরণ করব।

৩. ছাত্রের শিক্ষাদীক্ষার প্রতি বিশেষ নজর রাখব।

৪. ছাত্রকে যথাসম্ভব একরাম-সম্মান করব।

৫. ভালোভাবে লেখাপড়া করার জন্য ছাত্রকে সবসময় উৎসাহ জোগাব।

৬. ছাত্রকে প্রতিষ্ঠানের শিডিউল, রুটিন, বাড়ির কাজ, দাযিত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত করব।

৭. ছাত্রকে মানসম্মত, আধুনিক, উন্নত, কাযকর শিক্ষা প্রদানে সচেষ্ট থাকব।

৮. সবার সামনে নিদির্ষ্ট কোনো ছাত্রকে বকাঝকা করব না।

৯. আবাসিক ছাত্রদের জন্য মানসম্মত থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা। এটা ছাত্রদের মৌলিক অধিকার। ছাত্রদের প্রয়োজনীয় বিষয়াদি সরবরাহ করা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব।

১০. অঞ্চল, জাতপাত, ভাষা, বর্ণ, গোত্রের ভিত্তিতে ভেদাভেদ না করা। সবাইকে সমান অধিকার দেয়া। সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা।

১১. ছাত্র কোনো কিছু জানতে চাইলে, সঠিক উত্তর শিক্ষকের জানা না থাকলে, ভুলভাল উত্তর না দিয়ে, অজ্ঞতা স্বীকার করে নেওয়া, আমি জানি না বলা। সম্ভব হলে পরে উত্তরটা জানিয়ে দেয়া।

১২. শিক্ষকের উচিত নিয়মিত ছাত্রের যোগ্যতাবৃদ্ধি, সার্বিক উন্নতির

খোঁজখবর রাখা। ছাত্রকে এ ব্যাপারে উৎসাহ-প্রেরণা যুগিয়ে যাওয়া।
১৩. মাঝেমধ্যে ছাত্রদেরকে নিয়মতান্ত্রিক পড়াশোনার বাইরে ভিন্নধর্মী কর্মসূচিতে যুক্ত করা। খেলাধূলা, সামাজিক কাযক্রম, বৃক্ষরোপণ, পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচিতে জড়িত করা।
১৪. ছাত্ররা যেন মনখুলে নিজের সুবিধা-অসুবিধার কথা বলতে, এমন পরিবেশ বজায় রাখা।
১৫. ছাত্রদের মধ্যে যেন আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়, তারা যেন নিজ আগ্রহে পড়ালেখায় আগ্রহী হয়, এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা।

দাম্পত্যজীবনের আদাব

স্বামীর প্রতি স্ত্রীর আদাব

১. শরিয়তসম্মত কাজে স্বামীর আনুগত্য করা।
২. স্বামীর খেদমত করা।
৩. স্বামীর দেয়া উপহার, সাজ-সরঞ্জামের জন্য শুকরিয়া আদায় করা। মনখুলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। কোনো অবস্থাতেই স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করা।
৪. স্বামী রাগান্বিত হলে, স্ত্রীর কর্তব্য চুপ থাকা। স্বামীর সাথে মুখে মুখে তর্কে জড়িয়ে না পড়া।
৫. স্বামী ঘর থেকে বের হওয়ার সময় দরজা পযন্ত গিয়ে স্বামীকে বিদায় জানানো। যতক্ষণ দেখা যায়, আড়াল থেকে স্বামীর দিকে তাকিয়ে থাকা।
৬. স্বামীর আত্মীয়-স্বজনকে যথাযোগ্য একরাম-সম্মান করা।
৭. স্বামীর কষ্টার্জিত সম্পদ অনর্থক কাজে খরচ না করা। মিতব্যয়ী হওয়া।
৮. স্বামীকে খুশি করার জন্য সাজসজ্জা গ্রহণ করা।
৯. স্বামীকে আতর-সুবাস মাখিয়ে দেয়া।

১০. স্বামীর অনুপস্থিতিতে নিজের ইজ্জত-আবরু, স্বামীর ধনসম্পদের হেফাজত করা।
১১. স্বামীর ভুলগুলোকে যথাসম্ভব এড়িয়ে যাওয়া, ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা। স্বামীর দুর্বলতা অন্যদের বলে বেড়ানো থেকে বিরত থাকা।
১২. স্বামী কোনো কাজে ব্যর্থ হলে, স্বামী দুর্ব্যবহার করলে, যথাসম্ভব স্বামীকে ক্ষমা করা। প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে না ওঠা।
১৩. নিজের সবটুকু যোগ্যতা-শক্তিকে স্বামীর ঘর সুন্দর-সজ্জিত করার পেছনে ব্যয় করা।

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর আদাব

১. বিবির সাথে নরমকোমল, মহব্বতের সাথে কথা বলা।
২. ঘরের কাজকর্মে যথাসম্ভব বিবির সাথে হাত লাগানো।
৩. বিবির ভুলত্রুটি হলে সুন্দর ভাষায় ধরিয়ে দেয়া। বিবির সংশোধন করতে গিয়ে রূঢ় ভাষা ব্যবহার না করা। বকাবকি না করা। বিবির আত্মসম্মানে আঘাত লাগে এমন কথা না বলা।
৪. একাধিক বিবি থাকলে, সবার মাঝে ইনসাফ বজায় রাখা।
৫. বিবির কাছে যাওয়ার আগে নিজেকে যথাসম্ভব সুন্দর আর পরিচ্ছন্ন করে তোলা। উত্তম পোশাক পরা। সুবাস মাখা।
৬. সামর্থ অনুযায়ী বিবির জন্য খরচ করা।
৭. বিবির দীনি তালিম-তরবিয়ত, শিক্ষাদীক্ষার প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখা। দীনি জ্ঞানে ঘাটতি থাকলে, ব্যবস্থা করা।
৮. নামায-রোযা আদায়ের হুকুম দেয়া। আদায় করছে কি না, সচেতনভাবে খোঁজখবর রাখা। যে কোনো মূল্যে নামায-রোযা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
৯. বিবির কোনো আচরণ পছন্দ না হলে, স্বামী তিনটি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে,

প্রথম: বিবিকে নরমকোমল, মহব্বতপূর্ণ ভঙ্গিতে বোঝাবে। স্বামীর আনুগত্যের ফজিলত-সওয়াব স্মরণ করিয়ে দিবে। স্বামীর অবাধ্যতার পরিণতি, গুনাহ, শাস্তির কথা মনে করিয়ে দিবে।
দ্বিতীয়: স্ত্রী নিজেকে সংশোধন করে নিলে ভালো। না হলে স্বামী আলাদা বিছানায় শোয়া শুরু করবে। বিছানা পৃথক করতে গিয়ে, স্ত্রীকে একলা ঘরে রেখে চলে যাবে না।
তৃতীয়: এরপরও স্ত্রী নিজেকে সংশোধন না করলে, স্বামীর জন্য অনুমতি আছে, স্ত্রীকে হালকা সাজা প্রদান করার। খেয়াল রাখতে হবে, শরীরে দাগ পড়ে, যখন হয় এমন সাজা দেয়া যাবে না। চেহারায় আঘাত করা যাবে না। ইসলামি শিক্ষা বলে, উত্তম ও ব্যক্তিত্ববান স্বামী কখনো তৃতীয় ধাপ পযন্ত যায় না। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো স্ত্রীদের গায়ে হাত তোলেননি।

সন্তানের প্রতিপালন সম্পর্কিত আদাব

১. জন্মের পর শিশুর ডানকানে আজান, বামকানে একামত বলা।
২. একজন নেককার ব্যক্তিকে দিয়ে তাহনীক করানো। তাহনীক মানে, নেককার ব্যক্তি খুরমা বা মিষ্টিজাতীয় কিছু চিবিয়ে দিলে, প্রথম খাবার হিসেবে সেটা শিশুর মুখে দেয়া। এর মাধ্যমে শিশুর মধ্যে ওই নেককারের প্রভাব পড়বে, এমনটা মনে করা হয়।
৩. জন্মের সপ্তম দিনে আকীকা দিয়ে শিশুর জন্য সুন্দর নাম রেখে দেয়া।
৪. শিশুকে সবার আগে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ শেখানো। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি মহব্বত ও কুরআন শিক্ষা দেয়া।
৫. সন্তানকে দীনি শিক্ষা ও উত্তম দীক্ষা দেয়া।
৬. সন্তানকে কখনো বদদোয়া না করা।

৭. সাতবছর বয়েসে সন্তানকে নামাযের হুকুম দেয়া। দশবছর বয়েসে নামায না পড়লে সাজা দেয়া।

৮. দশবছর হয়ে গেলে সন্তানের বিছানা আলাদা করে দেয়া।

৯. সন্তানের শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপারে দ্বিধাদ্বন্দ্বে না ভোগা। দায়িত্বশীলতার সাথে সন্তানের শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১০. ছোটবেলা থেকেই সন্তানকে ইবাদত-বন্দেগীতে অভ্যস্ত করে তোলা। এজন্য নিজেই ইবাদত-বন্দেগীতে অভ্যস্ত হওয়া। মাতাপিতার দেখাদেখি সন্তানও ইবাদত করতে আগ্রহী হবে।

১১. কথাবার্তা, ওঠাবসা, খানাপিনা, লেনদেন ইত্যাদির আদাব সম্পর্কে ছোটবেলা থেকেই সন্তানকে শিক্ষা দেয়া।

১২. ভালোকাজের জন্য সন্তানকে উৎসাহ দেয়া, প্রশংসা করা। অনুচিত কাজ ও চিন্তার জন্য সতর্ক করা। প্রয়োজনে পরিমিত শাস্তি দেয়া।

১৩. বাচ্চাকে শাসন করার সময় স্নেহমমতার দিককে প্রাধান্য দেয়া। সন্তান যাতে বুঝতে পারে, শাসন করলেও, মাতাপিতা তাকে মহব্বত করেন।

১৪. সন্তানের সাথে হাসিখুশিপূর্ণ আচরণ করা। রূঢ়, কর্কশ, নির্দয় আচরণ করা থেকে বিরত থাকা।

১৫. বাচ্চাদেরকে নিয়মিত ওয়াজ-নসিহত করা। সন্তান যাতে ইলম, আমল, আখলাক সম্পর্কে অবগত হতে পারে, এই ব্যবস্থা করা।

১৬. বাচ্চাদের শিক্ষাদীক্ষার পাশাপাশি তাদের শারীরিক উন্নতি, প্রবৃদ্ধির দিকেও খেয়াল রাখা। এজন্য ভালো, পুষ্টিকর খাবারের ব্যবস্থা করা। প্রযাপ্ত ঘুম-বিশ্রামের ব্যবস্থা রাখা।

১৭. প্রয়োজনীয় পকেট খরচ দেয়া। এতেকরে তারা আত্মবিশ্বাসী, দায়িত্বশীল, আয়ব্যয়ের ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠবে। প্রয়োজন-অপ্রয়োজন বুঝতে শিখবে। এসব বিষয়ে তাদেরকে নিয়মিত

বোঝাতে থাকা।

১৮. সন্তানের ভুলত্রুটিকে উপেক্ষা করা না করা। দোষ করার পরও নিজের সন্তানকে নির্দোষ মনে করার প্রবণতা থাকলে, পরিহার করা। এতেকরে সন্তান বিগড়ে যায়।

১৯. পবিত্র, পরিচ্ছন্ন থাকার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা। সবসময় ওজু অবস্থায় থাকার তাকিদ দেয়া।

২০. আম্বিয়ায়ে কেরাম, সাহাবায়ে কেরাম, সালাফ-সালেহীনের জীবনী ও ঘটনাবলী শোনানো। কুরআন ও সুন্নাহর কাসাস শোনানো।

২১. সন্তানকে স্মার্ট ফোন না দেয়া।

২২. প্রয়োজন দেখা দিয়ে, নিজের তত্ত্বাবধানে ইন্টারনেট ব্যবহার করতে দেয়া। অগোচরে ইন্টারনেট-স্মার্টফোন ব্যবহারের অনুমতি না দেয়া।

২৩. সন্তানকে হারামাইন শরীফাইন, মসজিদে আকসার সাথে পরিচিত করে তোলা। এই মুবারক স্থানগুলোর ফজিলত-বরকত সম্পর্কে জানানো।

২৪. সন্তানকে অমুসলিমের পোশাক ও কৃষ্টিকালচার থেকে দূরে রাখা। সন্তানের মনে এসবের প্রতি বিরাগ সৃষ্টি করা। ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতি, রীতিনীতির প্রতি আন্তরিক, শ্রদ্ধাশীল, অনুগত করে তোলা।

২৫. ক্ষতিকর খাবারদাবার থেকে সন্তানকে সুরক্ষিত রাখা। অতিরিক্ত চকলেট, ক্যান্ডি, আইসক্রিম খাওয়ার কুফল সম্পর্কে অবহিত করা।

২৬. ছেলেকে মেয়ের ওপর প্রাধান্য না দেয়া। সবার প্রতি সমান স্নেহমমতা প্রদর্শন করা।

প্রতিবেশির আদাব

১. প্রতিবেশির সাথে উত্তম আচরণ করব। তার সাথে সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখব। তার কল্যাণকামী হবো। সুখে-দুঃখে তার পাশে

দাঁড়াব। তার জন্য সবসময় সহযোগিতার দরজা খোলা রাখব।
২. প্রতিবেশি গরিব হলে, সাধ্যমতো সাহায্য করব।
৩. শরিয়তের সীমায় থেকে হাসিকান্নায় প্রতিবেশির সাথে শরিক হবো। শিশু জন্মলাভ করলে, কেউ পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করলে, চাকরি পেলে, কারো বিয়েশাদি হলে, তাদের অভিনন্দন জানাতে এগিয়ে যাবো। কেউ মারা গেলে শোকসন্তাপে শরিক থাকব। ব্যবসাবাণিজ্যে ক্ষতি হলে, দুর্ঘটনা ঘটলে, অপ্রীতিকর ঘটনার মুখোমুখি হলে সান্ত্বনা দিতে এগিয়ে যাবো।
৪. সময় সময় এটাসেটা হাদিয়া পাঠাব।
৫. কেউ মারা গেলে শোক প্রকাশ করব। ঈমান-আকীদা ঠিক থাকলে, জানাযায় শরিক হবো।
৬. প্রতিবেশির অনুপস্থিতিতে তার ঘরবাড়ি পাহারা দিয়ে রাখব।
৭. সময়সুযোগ বুঝে প্রতিবেশিকে ভালোকাজের নসিহত করব, মন্দকাজ থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানাব।
৮. প্রতিবেশির কষ্ট হয় এমন কাজ করব না।
৯. নিজের ঘরদোর পরিচ্ছন্ন রাখতে গিয়ে, ময়লা-আবর্জনা প্রতিবেশির সীমানায় ফেলব না।
১০. ঘরে ভালো কিছু রান্না হলে প্রতিবেশিকেও খেতে দিব।
১১. বাড়ির ছাদ থেকে প্রতিবেশির ভেতরবাড়ি দেখা গেলে, ছাদে ওঠার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করব। ছাদে দীর্ঘসময় কাজ করলে, প্রতিবেশিকে জানিয়ে রাখব।
১২. সবচেয়ে কাছের প্রতিবেশি বেশি সৌজন্য পাওয়ার অধিকারী হবে। এরপর যতদূরে যাবে, প্রতিবেশির অধিকার কমে আসতে থাকবে।
১৩. প্রতিবেশির পক্ষ থেকে কষ্টদায়ক আচরণ পেলে, সবর করব। মন্দের জবাবে মন্দ আচরণ করব না।

বন্ধুত্বের আদাব

১. নেককার, দীনদার, চরিত্রবান, বিশুদ্ধ আকীদাসম্পন্ন ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব করা উচিত। মানুষ তার সঙ্গী দ্বারা প্রভাবিত হয়। এজন্য বন্ধুত্ব বাছাইয়ে সতর্ক থাকা উচিত।

২. কাফের, মুশরিক, বেদাতির সাথে কস্মিনকালেও বন্ধুত্ব করব না। অনৈসলামী আকিদা-বিশ্বাস পোষণকারীর সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব করা না-জায়েজ। সামাজিক সহাবস্থানের খাতিরে বাহ্যিক সৌজন্য দেখানো যাবে।

৩. আল্লাহর সন্তুষ্টিই হবে বন্ধুত্বের মূল বুনিয়াদ। শুধু দুনিয়াবি স্বার্থ হাসিলের জন্য বন্ধুত্ব করা থেকে বিরত থাকা উচিত।

৪. বন্ধুত্ব করতে গিয়ে ইনসাফের সীমা অতিক্রম করব না। প্রয়োজনে সম্পর্ক ছিন্ন করতে গেলে যাতে ক্ষতির সম্মুখিন হতে না হয়।

৫. বন্ধুর গুণগুলো সামনে রেখে ভুলগুলো এড়িয়ে যাওয়া উচিত। সময়সুযোগ বুঝে বন্ধুকে তার ভুলত্রুটি ধরিয়ে দেয়া উচিত। উপযুক্ত পন্থায় তার চিন্তা ও আচরণগত ভুলগুলো সম্পর্কে সচেতন করা উচিত।

৬. আমার প্রতি বন্ধুর করণীয় কী, সেটা জানানোর আগে, বন্ধুর প্রতি আমার করণীয় কি, সেটার প্রতি বেশি মনোযোগ দেয়া উচিত।

৭. ভারসাম্যপূর্ণ পন্থায় পরস্পর হাদিয়া বিনিময় করা উচিত।

৮. বন্ধুর জন্য সাহায্যের দরজা সবসময় উন্মুক্ত রাখা।

৯. বন্ধুর সাথে ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা উচিত। তার সাথে হাসিখুশিপূর্ণ আচরণ করা উচিত। হাস্য-রসিকতা করতে গিয়ে, তার ব্যক্তিত্বে বা অহমে আঘাত লাগে, এমন কিছু করা থেকে বিরত থাকা উচিত।

১০. নিজের জন্য যা পছন্দ করব, বন্ধুর জন্যও তা পছন্দ করব।

১১. নেককাজে একে অপরের সহযোগিতা করব। মন্দকাজে সহযোগিতা করা থেকে বিরত থাকব।
১২. বন্ধুর মৃত্যুতে তার জন্য নিয়মিত মাগফিরতের দোয়া করে যাবো। তার পরিবার-পরিজনের খোঁজখবর রাখব।

সাধারণ মুসলমানের প্রতি আদাব

১. শরিয়তে একজন মুসলমানের প্রতি আরেকজন মুসলমানের যেসব অধিকারের কথা বলা হয়েছে, সেগুলো আদায় করা। সালামের জবাব দেয়া, অসুস্থ হলে দেখতে যাওয়া, মারা গেলে জানাযা, কাফনদাফনে শরিক হওয়া, দাওয়াত দিলে কবুল করা, হাঁচির পর আলহামদুলিল্লাহর জবাবে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলা।
২. কোনো মুসলিম ভাই বিপদে পড়লে সাধ্যমতো তার পাশে দাঁড়ানো।
৩. মুসলিম ভাইয়ের জানমাল, ইজ্জত, আব্রু হেফাজত করা।
৪. বড়দের সম্মান করা, ছোটদের স্নেহ করা।
৫. কোনো কাজে পরামর্শ চাইলে বিশ্বস্ততার সাথে সাধ্যমতো সাহায্য করা।
৬. নিজের মুখ ও হাতের অনিষ্ট থেকে মুসলিম ভাইকে নিরাপদ রাখা।
৭. ভালোকাজে মুসলিম ভাইকে সাহায্য করা, অন্যায় ও জুলুমে মুসলিম ভাইয়ের সাথে না থাকা। মুসলিম ভাইকে বুঝিয়ে শুনিয়ে অন্যায় থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করা।
৮. একজন আরেকজনকে তাকওয়া, দ্বীনদারির নসিহত করা।
৯. প্রয়োজন দেখা দিলে, জায়েজ কাজে মুসলিম ভাইয়ের অনুকূলে সুপারিশ করা।
১০. একে অপরকে সুন্দর নাম ও উপাধিতে সম্বোধন করা।
১১. অন্য মুসলিম ভাই দরদাম করা অবস্থায় গায়ে পড়ে সে পণ্যের

দাম না হাঁকানো।

১২. আরেকজনের প্রস্তাব দেয়া বাড়িতে নিজেও বিয়ের প্রস্তাব না দেয়া। অন্যের কথাবার্তা শেষ হয়ে বিয়ে না হওয়া নিশ্চিত হলে, তারপর নিজে প্রস্তাব দেয়া।

১৩. মুসলিম ভাই কথা বললে, সেটা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করা।

১৪. কোনো মুসলিম ভাইয়ের গীবত না করা, গীবত না শোনা। কারো ওপর মিথ্যা অপবাদ না দেয়া, তার সম্পর্কে অপবাদমূলক কথায় কর্ণপাত না করা। অন্যের দোষত্রুটি অন্বেষণ না করা। অন্যের নাম বিকৃত না করা। অন্যকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে না দেখা। অন্যকে হিংসা না করা, অন্যের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ না করা।

মেজবানের আদাব

১. সামর্থ অনুযায়ী মেহমানের সম্মান করা। মেহমানের আগমনকে আল্লাহর রহমত ও বরকত লাভের কারণ মনে করা। মেহমানের আগমনে অসন্তোষ প্রকাশ না করা।

২. মেহমান আসার আগেই প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সেরে রাখা। মেহমানখানা গুছিয়ে রাখা, হাম্মামখানা পরিচ্ছন্ন করে রাখা, হাম্মামে পরিষ্কার তোয়ালে, টিস্যু, সাবান, শ্যাম্পু, ব্রাশ, পেস্ট, মিসওয়াক রেখে দেয়া। এয়ারকুলার, হিটিং সিস্টেম ঠিকমতো কাজ করছে কি না, দেখে রাখা।

৩. মেহমানখানায় কুরআন কারীম, তাসবীহ, জায়নামাজ রেখে দেয়া। কেবলা নির্দেশক চিহ্ন রাখা।

৪. মেহমান ঘরে এলে সালাম, মুসাফা, মুয়ানাকার পর হালকা নাস্তা, শরবত পরিবেশন করা।

৫. মেহমানের সাথে হাস্যোজ্জল চেহারা নিয়ে সাক্ষাত করা। তার আগমনে আনন্দ প্রকাশ করা।

৬. মেহমানের আরামের দিকে সবসময় খেয়াল রাখা।
৭. মেহমান লম্বাসময় থাকলে, প্রথম তিনদিন সাধ্যমতো ভালো খাবারদাবারের আয়োজন করা। তারপর স্বাভাবিক খাবার পরিবেশনে কোনো সমস্যা নেই।
৮. সবারই কিছু বিষয়ের প্রতি অনুরাগ বা বিরাগ থাকে। মেহমানের কাছ থেকে সেটা জেনে নেয়ার চেষ্টা করা। মেহমান কোনো কিছু খেতে না চাইলে, তাকে জোরাজুরি না করা।
৯. মেহমান খাবার গ্রহণকালে মেহমানের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে না থাকা। খাবারের পাত্র মেহমানের সামনে থেকে না সরানো।
১০. সম্ভব হলে মেজবানও মেহমানের সাথে খেতে বসা।
১১. বিদায়কালে মেহমানের সাথে কিছুদূর পযন্ত এগিয়ে যাওয়া। অন্তত দরজা পযন্ত তো অবশ্যই।

মেহমানের আদাব

১. প্রয়োজন ছাড়া কারো বাড়িতে মেহমান হওয়া উচিত নয়। প্রয়োজনে কোথাও মেহমান হলে, মেজবানের ওপর বোঝা হয়ে যাচ্ছে কি না, সেদিকে খেয়াল রাখা।
২. কোথাও মেহমান হলে, আগেই জানিয়ে দেয়া। মেজবানকে নিজের কর্মসূচি, গতিবিধি সম্পর্কে অবহিত করা উত্তম। কতজন, কখন, কতদিন থাকব, কখন পৌঁছব বিস্তারিত জানিয়ে দেয়া কর্তব্য। কোন খাবার পছন্দ, সেটাও জানিয়ে দেয়া যেতে পারে।
৩. মেজবানের আরাম-বিশ্রামের দিকেও খেয়াল রাখা উচিত। বেড়াতে এসে এমন কাজ করা উচিত নয়, যাতে মেজবানের কষ্ট হয়। এমন কথা বলা উচিত নয়, যাতে মেজবান বিব্রতবোধ করে।
৪. মেজবানবাড়ির জিনিসপত্রের হেফাজত করবে। সাথে থাকা ছোটবড় সবাইকে এ ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়া কর্তব্য।

৫. মেজবানের বাড়ি থেকে অন্য কোথাও যাওয়ার থাকলে, মেজবানকে আগেই জানিয়ে দেয়া, যাতে মেজবান বাড়তি রান্না না করে।

৬. পুরুষ মেহমান মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে নামায আদায় করবে। মহিলা হলে ঘরে নামাযের প্রতি যত্নবান থাকবে।

৭. পুরুষ মেহমান যদি দেখে বাড়িতে মেজবান পুরুষ নেই, শুধু গাইরে মাহরাম নারী আছে, তাহলে ফেরত যাবে বা অন্য কোথাও থাকার বন্দোবস্ত করবে। ঘরে মাহরাম নারী থাকলে বা সম্পূর্ণ আলাদা ঘরে থাকার ব্যবস্থা থাকলে, থেকে যেতে পারবে।

৮. কোথাও শুধু খাবারের দাওয়াত থাকলে বিলম্ব না করে সময়মতো পৌঁছা উচিত। নিজের কোনো আচরণ দ্বারা মেজবানকে বিব্রত না করা। খাবারশেষে বসে না থেকে তাড়াতাড়ি মেজবানবাড়ি ত্যাগ করা উচিত।

৯. মেজবানের কাজে নিজেও হাত লাগিয়ে সহযোগিতা করা, নারী মেহমানও মেজবান নারীর কাজে সহযোগিতা করা ভালো। পুতুলের মতো বসে না থাকা।

১০. মেজবানের কাছ থেকে বিদায় নেয়ার সময় মেহমানদারির জন্য শুকরিয়া আদায় করা। দোয়া করা।

১১. মেহমানদারিতে কোনো কমতি-ঘাটতি হলে, সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করা। সেটা নিয়ে সমালোচনা না করা।

মজলিসের আদাব

১. ভালো ও নেককার মানুষের মজলিসে হাজির হওয়ার চেষ্টা করা। মন্দ ও বদকার লোকের বৈঠক-সভা এড়িয়ে চলা।

২. নাচগানের অনুষ্ঠানে না যাওয়া। অশ্লীলতা চলছে, গানবাদ্য বাজছে, গীবত-শেকায়েত হচ্ছে, কারো বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছে এমন

বৈঠক-মজলিসে না বসা। বসা থাকলে উঠে চলে আসা।
৩. মজলিসে বসার আগে সবাইকে সালাম দেয়া।
৪. মজলিসে যেখানে জায়গা পাওয়া যায়, বসে পড়া। মানুষের কাঁধ ডিঙ্গিয়ে, অন্যকে সরিয়ে না বসা।
৫. কাউকে আপন জায়গা থেকে উঠিয়ে দিয়ে না বসা। কেউ সম্মান করে জায়গা ছেড়ে দিলে, তাহলে বসা।
৬. বড় কোনো ব্যক্তি মজলিসে হাজির হলে, নিজের জায়গা ছেড়ে তাকে বসতে দেয়া।
৭. কথোপকথনরত দুই ব্যক্তির মধ্যে অনুমতি ছাড়া না বসা।
৮. বৈঠক-মজলিসে ছড়িয়ে ছিটিয়ে না বসা। কাছাকাছি হয়ে বসা।
৯. গোল হয়ে বসা মজলিসে মধ্যখানে গিয়ে না বসা। মজলিসে নিজেকে জাহির করার চেষ্টা না করা। ইচ্ছা করে অন্যকে উপেক্ষা করার চেষ্টা না করা।
১০. মজলিসে যে বিষয়ে আলোচনা-মতবিনিময় চলছে, তাতে সাধ্যমতো অংশ নেয়া। ভাব দেখিয়ে চুপচাপ বসে না থাকা।
১১. মজলিসে যে বিষয়ে আলোচনা চলছে, প্রয়োজনমাফিক নিজেও শরিক হওয়া। শরিয়তবিরোধী কোনো আলোচনা চললে, কারো বিরুদ্ধে প্রমাণহীন সমালোচনা শুরু হলে, নিজেকে গুটিয়ে রাখা।
১২. কারো কথার মাঝে কথা না বলা। একজন কথা শেষ করার পরই নিজের বক্তব্য পেশ করা।
১৩. মজলিসে হাসির কথা হলে, অট্টহাসি দিয়ে না ওঠা। যতদূর সম্ভব মুসকি হাসি দিয়ে শরীক থাকা।
১৪. মজলিসে যথাসম্ভব আল্লাহর যিকির ও আখেরাতের স্মরণ দ্বারা সমৃদ্ধ করা।
১৫. তিনজনের বৈঠক হলে, একজনকে পাশ কাটিয়ে বাকি দুজন আলাদা হয়ে ফিসফিস কথায় মশগুল হয়ে না পড়া। দুজনে এমন

ভাষায় কথা না বলা, যে ভাষা তৃতীয় ব্যক্তি বোঝে না। তিনজনের বেশি হলে দুজন আলাদা হয়ে কথা বললে বা ভিন্ন ভাষায় কথা বললে কোনো সমস্যা নেই।

১৬. মজলিসে আল্লাহর নাফরমানি হতে দেখলে সাধ্যমতো বাধা দেয়ার চেষ্টা করা। নাফরমানি থেকে বিরত হলে ভালো, না হলে নিজে উঠে যাওয়া।

১৭. মজলিস আমানত। মজলিসের গোপন কথা-আলোচনা বাইরে প্রকাশ করা উচিত নয়।

১৮. মজলিসে বসে নির্দিষ্ট একজনকেই বারবার গুরুত্ব দেয়া উচিত নয়, এতে অন্যরা বিরক্ত হয়।

১৯. মজলিসে বসার আগে মোবাইল বন্ধ বা সাইলেন্ট করে নেওয়া উচিত।

২০. মজলিস থেকে ওঠার সময় দোয়া পড়ব,

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়াবিহামদিকা, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা অন্তা, আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক।"

হে আল্লাহ! আপনি পবিত্র, আমি আপনার প্রশংসা করি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনার দিকে প্রত্যাবর্তন করছি।

সালামের আদাব

১. ইসলামী রীতিতে সালাম দেয়া। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ বলা। অমুসলিমের মতো দেখা হলেই 'হ্যালো' ইত্যাদি বলে সম্ভাষণ না জানানো।

২. আগে আগে সালাম দেয়ার অভ্যাস করা।

৩. মুশরিক-কাফেরকে আগে সালাম না দেয়া। সে সালাম দিলে, জবাবে শুধু ওয়া আলাইকুম বলা।

৪. ছোটরা বড়কে, হেঁটে চলা ব্যক্তি উপবিষ্টকে, ছোটদল বড়দলকে আগে সালাম দিবে।

৫. শিশুদেরও সালাম দেয়া। এতেকরে তারা সালাম দেয়া-নেওয়া শিখবে।

৬. মজলিসে কয়েকজন বসা থাকলে, নির্দিষ্ট একজনের নাম ধরে সালাম না দেয়া। সবার উদ্দেশ্যে সালাম উচ্চারণ করা। মজলিসের একজন সালাতের উত্তর দিলে, সবার পক্ষ থেকে দায়িত্ব আদায় হয়ে যাবে।

৭. মজলিসে উপবিষ্ট নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির নাম ধরে সালাম দেয়া হলে, সম্বোধিত ব্যক্তির ওপর জবাব দেয়া ওয়াজিব হবে।

৮. ঘরে প্রবেশ করার সময় গৃহবাসীকে সালাম দেয়া।

৯. খালিঘরে প্রবেশকালে 'আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সলিহিন বলা। তাহলে ঘরে থাকা ফিরিশতাগণ জবাব দিবেন।

১০. কেহ লোক মারফতে সালাম পাঠালে, জবাবে ওয়া আলাইকা ওয়া আলাইহিস সালাম বলা। অনুপস্থিত কারো কাছে সালাম পাঠালে, অমুককে আমার সালাম দিয়ো না বলে, অমুককে আমার পক্ষ থেকে 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ' বলো। সালাম পৌঁছানোর সময় বলব, অমুকে আপনাকে 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ' বলেছেন বলব।

১১. কক্ষে কেউ ঘুমিয়ে থাকলে, তিলাওয়াত বা পড়াশোনায় থাকলে, উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে আস্তে সালাম দিবো।

১২. কারো সাথে সাক্ষাতের শুরুতে সালাম দিবো, একটুপর

বিদায়কালেও সালাম দিবো।

১৩. মাহরাম নারী বা পুরুষকে সালাম দিতে পারব। গাইরে মাহরাম নারী বা পুরুষকে সালাম দেয়া থেকে বিরত থাকব।

১৪. নিম্নোক্ত ব্যক্তিকে সালাম দিবো না

নামায, তিলাওয়াত, যিকির, খুতবা, বয়ানরত ব্যক্তিকে। পাঠদানকারী ব্যক্তিকে, পাঠগ্রহণকারী ছাত্রকে, হাদীস-ফিকহ বর্ণনাকারী ব্যক্তিকে, আযান-একামতদানরত ব্যক্তিকে, খাবার গ্রহণরত ব্যক্তিকে, হাম্মামে থাকা ব্যক্তিকে, প্রকৃতির ডাকে সাড়া দানরত ব্যক্তিকে, সতর খোলা ব্যক্তিকে, বিড়ি-সিগারেট-হুক্কা সেবনরত ব্যক্তিকে, গুনাহের কাজে লিপ্ত ব্যক্তিকে, নাচগানরত ব্যক্তিকে, কবুতর-জুয়া-দাবা খেলারত ব্যক্তিকে।

১৫. মজলিসে মুসলিম ও অমুসলিম উভয় সম্প্রদায় থাকলে, শুধু মুসলমানদের নিয়ত করে সালাম দিবো।

১৬. 'বারাকাতুহু'-এর পর আর কোনো শব্দ সংযোজন না করা ভাল।

রোগি দেখার আদাব

১. সওয়াব মনে করে রোগি দেখতে যাবো। রোগি দেখতে যাওয়ার পেছনে পার্থিব গরজ না থাকা কাম্য। এই নিয়তে রোগি দেখতে যাবো না, আমি আজ গেলে কাল আমি অসুস্থ হলে আমাকে দেখতে আসবে। এজন্যও যাবো না, উনি বড় মানুষ, তাকে দেখতে গেলে সুস্থ হয়ে আমাকে মনে রাখবেন। বা ওনাকে দেখতে গেলে মিডিয়ায় প্রচার পাওয়া যাবে।

২. রোগির যদি ওঠাবসা করতে, কথাবার্তা বলতে কষ্ট হয়, দেখার পর দ্রুত চলে আসা উচিত। আমার অবস্থানে রোগি যদি খুশি হন, তাহলে থাকা যেতে পারে।

৩. অসুস্থ ব্যক্তি সবর করলে কী সওয়াব, সেটা সুযোগ পেলে জানিয়ে

দিবো। রোগিকে সান্ত্বনা দিয়ে আসব। সবর করলে গুনাহ মাফ হবে, এটা স্মরণ করিয়ে দিবো।

৪. এমন কথা বলব না, যাতে জীবন বা আরোগ্যলাভ সম্পর্কে রোগি ও আত্মীয়গণ নিরাশ হয়ে পড়েন। আশার কথা শুনিয়ে আসব।

৫. রোগির সাথে পূর্বে শত্রুতা, বিরোধ থাকলেও তাকে দেখতে যাবো।

৬. রোগি বেহুঁশ হলেও তাকে দেখতে যাবো। আল্লাহর কাছে তার সুস্থতার জন্য দোয়া করব।

৭. অমুসলিম রোগিকেও দেখতে যাবো। সুযোগ পেলে আল্লাহ তাআলা, ইসলামের কথা বলব। দাওয়াত দিবো। আল্লাহ চাইলে দাওয়াত কবুলও করে নিতে পারেন।

৮. রোগির খারাপ না লাগলে, রোগি গাইরে মাহরাম না হলে, রোগির শরীরে ডান হাত রেখে পড়ব,

اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، أَذْهِبِ الْبَأْسَ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا

"আল্লাহুম্মা রাব্বান্-নাস, আযহিবিল বা'স, ইশফি, আনতাশ্-শাফি, লা শিফা'আ ইল্লা শিফাউক, শিফাউল্লা ইউগাদিরু সাকামা"

হে মানবজাতির প্রতিপালক আল্লাহ! কষ্ট দূর করে দিন, আপনি আরোগ্য দিন। আপনি ছাড়া আরোগ্যদাতা কেউ নেই। আপনারই আরোগ্য দিন, এমন আরোগ্য যা কোনো ব্যাধি অবশিষ্ট রাখে না।"

৯. রোগির কাছে বসে সাতবার পড়ব,

أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ، رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، أَنْ يَشْفِيَكَ

আসআলুল্লাহাল আযীম, রব্বাল আর্শিল আযীম, আন ইয়াশফিয়াকা"

আমি মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি, যিনি মহান আরশের

অধিপতি, যেন তিনি তোমাকে আরোগ্য দান করেন।
১০. রোগি দেখে উঠে আসার সময় পড়ব,

لَا بَأْسَ، طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

লা বা'সা, তহূরুন ইন শা'আল্লাহ"
কোনো চিন্তা নেই, ইনশাআল্লাহ এ রোগ পাপ মোচনের উপায় হবে।"
১১. রোগির রোগ, ওষুধপত্র, আরাম, কষ্ট সম্পর্কে এমন প্রশ্ন করব না, যাতে রোগি বিব্রত বোধ করে।
১২. রোগির কাছে গাইরে মাহরাম নারী থাকলে, নজরের হেফাজত করব।
১৩. সাধ্যমতো রোগির জন্য ফলমুল নিয়ে যাবো।
১৪. সবচেয়ে ভালো হয়, যতটা সম্ভব নগদ টাকা হাদিয়া হিসেবে পেশ করা।
১৫. রোগকে রোগীর গুনাহের ফল, অসাবধানতার ফল ইত্যাদি মনে করব না। রোগির কাছে এসব বলবও না।

শোক প্রকাশের আদাব

১. মৃতের শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সান্ত্বনা দেয়ার সময় এই নিয়ত করব, আমি সুন্নতের ওপর আমল করছি।
২. সান্ত্বনা দেয়ার সময় এমন ভাষা ব্যবহার করব, যাতে শোকাহত পরিবারের দুঃখ লাঘব হয়, তারা যেন বুঝতে পারে, আমিও তাদের সমব্যথী।
৩. সান্ত্বনাদানকালে এমন আলোচনা পরিহার করব, যা শোকাহত পরিবারের শোক-বেদনা আরো বাড়িয়ে দেয়।
৪. সান্ত্বনা দেয়ার সময় মাসনুন বাক্য বলে শোক প্রকাশ করব,

إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى، فَلْتَصْبِرْ

وَلْتَحْتَسِبْ

নিশ্চয়ই আল্লাহরই মালিকানায় রয়েছে যা তিনি গ্রহণ করেছেন, এবং তাঁরই ছিল যা তিনি দিয়েছেন। সব কিছুরই একটি নির্ধারিতসময় রয়েছে। অতএব, আপনি ধৈর্য ধারণ করুন এবং সাওয়াবের আশা রাখুন।

৫. অমুসলিম প্রতিবেশি, পরিচিতজন মারা গেলেও পরিবারকে সান্ত্বনা দেয়া যায়। তবে, মৃত কাফেরের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করা যায় না। কাদিয়ানির মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা জায়েজ নেই। শোকাহত অমুসলিম পরিবারকে একথা বলতে পারি, আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে উত্তম বিনিময় দান করুন, আপনাদের সাথে উত্তম আচরণ করুন।

৬. মৃত্যুর তিনদিনের মধ্যে শোক প্রকাশ করা ভালো। বিশেষ কোনো কারণে বিলম্ব হলে সমস্যা নেই।

৭. শোকপ্রকাশ সরাসরি করা যায়। চিঠি, ম্যাসেজ, ফোন, ই-মেইল, ওয়াটসএ্যাপ দিয়েও করা যায়।

৮. কেহ শোক প্রকাশ করলে, পরবর্তী সময়ে সম্ভব হলে, তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানো ভালো।

সাক্ষাতের আদাব

১. কারো সাথে সাক্ষাত করতে চাইলে তার ব্যস্ততা, বিশ্রামের সময়ের দিকে খেয়াল রাখা কর্তব্য।

২. যার সাথে সাক্ষাত করব, তার নিয়মিত রুটিন কি সেটা জেনে যাওয়া উচিত।

৩. যার কাছে যাচ্ছি, তাকে আগে জানিয়ে দেয়া।

৪. সাক্ষাতের সময় সালাম, মুসাফা করা। হাসিমুখে সাক্ষাত করা। উত্তম আচরণ করা।

৫. কারো সাথে সাক্ষাত করতে গেলে, তিনি ব্যস্ততার কারণে দেখা করতে না পারলে, কিছু মনে না করে ফিরে যাওয়া।

৬. সাক্ষাতটা যেন প্রয়োজনীয় হয়, বিনা প্রয়োজনে কারো সাথে সাক্ষাত না করাই উত্তম। বিশেষ করে ব্যস্ত ব্যক্তির সাথে।

৭. বিনা দরকারে সাক্ষাত দীর্ঘ না করা। সাক্ষাতের উদ্দেশ্য পুরো হতেই রুখসত হয়ে যাওয়া। হাঁ, যার সাথে সাক্ষাত করেছি, তিনি আমার দীর্ঘ অবস্থানে বিরক্ত না হয়ে খুশি হলে, বসে থাকতে সমস্যা নেই।

৮. কারো সাথে সাক্ষাত করতে গেলে, তিনি অন্য কারো সাথে গোপন কথায় ব্যস্ত থাকলে, গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শে থাকলে, তাদের কথা যেন আমার কানে না আসে এমন দূরত্বে সরে আসা। অনেক সময় এমন হয়, ঘরের মালিক আমাকে উঠে যেতে বলতে সংকোচ বোধ করেন। নিজ থেকেই উঠে যাওয়া কাম্য।

৯. কারো ঘরে গেলে, গৃহকর্তার দেখানো জায়গায় বসা, অবস্থান করা উচিত।

১০. সাক্ষাতের জন্য অবস্থানকালে বাড়ির মহিলাদের দিকে না তাকানো।

১১. কারো ঘরে গিয়ে ওখানকার জিনিসপত্রের দিকে লোলূপ-বুভুক্ষদৃষ্টিতে তাকিয়ে না থাকা।

১২. একান্ত সাক্ষাতের কথা বাইরে ফলাও করে প্রচার না করা।

১৩. সাক্ষাতশেষে সালাম-মোসাফা করে হাসিমুখে বিদায় নেয়া।

কথোপকথনের আদাব

১. কথা বলার আগে চিন্তা করব, আমার মুখ খোলাটা দরকার কি না?

কথা বলাটা উপকারী হবে কি না? উপকারী হলে কথা বলব নইলে চুপ থাকব।

২. যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু কথা বলব, প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা বলব না।

৩. বৈঠকে বড় (ইলমে, বয়েসে, পদে) কেউ থাকলে, তাদেরকে প্রথমে কথা বলতে দেয়া। প্রয়োজন ছাড়া নিজে কথা শুরু না করা।

৪. দ্রুত কথা না বলে, ধীরেসুস্থে, স্পষ্ট উচ্চারণে কথা বলা।

৫. কেউ কথা বললে, মনোযোগ দিয়ে তার কথা শোনা।

৬. কথা বলার সময় প্রয়োজনে হাতের ইশারা, মুখভঙ্গি ব্যবহার করা যেতে পারে। এসবের অতিরিক্ত এড়িয়ে চলা উত্তম।

৭. বিষয়টা জটিল হলে, গুরুত্বপূর্ণ অংশ তিনবার পুনরাবৃত্তি করা যেতে পারে। শ্রোতা বিরক্ত হওয়ার আশংকা থাকলে, একবার বলেই সামনে চলে যাবে।

৮. কথাবার্তায় সবসময় সত্য বলা উচিত। নিজের বক্তব্য দৃঢ় করার জন্য, শ্রোতাদের ছোট করার জন্য, কখনোই মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ না করা।

৯. গুনাহ হয় এমন আলোচনা পরিহার কর উচিত। বিনা প্রয়োজনে কসম খাওয়া, মিথ্যা কসম খাওয়া, অন্যায়কাজে সুপারিশ করা, মিথ্যা অপবাদ দেয়া, গীবত করা, অন্যের ছিদ্রান্বেষণ করা, কাউকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা, কাউকে মন্দ নাম বা উপধিতে সম্বোধন করা, নিজের বড়ত্ব জাহির করা, অন্যকে খাটো করে দেখানো, গালিগালাজ করা থেকে নিজের কথাবার্তাকে পবিত্র রাখা।

১০. ন্যায়, ইনসাফের কথা বলা। নিজের বা আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হলেও সত্যকথনে পিছপা না হওয়া।

১১. সবসময় হকপথে চলা। হককথা বলা। কোনো অবস্থাতেই না-

হক কথা না বলা, বাতিলের সমর্থন না করা।

১২. বেগানা পুরুষের সাথে কথা বলতে বাধ্য হলে, নারী নিজের গলার স্বরকে কিছুটা কঠিন করে তুলবে। নরমকোমল, চিকনস্বরে পরপুরুষের সাথে কথা বলবে না।

১৩. অহংকারী ভঙ্গিতে, দম্ভভরে কথা না বলা।

১৪. সাফসাফ কথা বলা। কথায় কোনো ধরণের অস্পষ্টতা গোঁজামিল না রাখা। অর্ধেক ভেতরে, অর্ধেক বাইরে, এমন অসম্পূর্ণ কথা না বলা। শ্রোতারা এমন কথায় প্রচণ্ড বিরক্ত হয়।

১৫. বড় কোনো ব্যক্তি, যেমন মা-বাবা, উস্তাদ, শায়খ, আলেম, মুফতি, ইমামের সাথে কথা বলার সময়, তার অবস্থান, মযাদার প্রতি লক্ষ্য রেখে কথা বলা উচিত। তাদেরকে প্রাপ্য সম্মান দিয়ে কথা বলা উচিত। প্রয়োজনের অতিরিক্ত গলার স্বর উঁচু করা উচিত নয়। ছোট কারো সাথে কথা বলার সময়, গলার স্বরে স্নেহমমতা প্রকাশ পাওয়া উচিত।

১৬. কথাবার্তায় কোনো ফাসেক, পাপীর প্রশংসা না করা। আমার প্রশংসা শুনে কেউ ফাসেক ব্যক্তির প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়লে, তার দায় আমার ওপরই বর্তাবে।

১৭. দুজন ব্যক্তি কথা বললে, আড়ি পেতে তাদের কথা শোনার চেষ্টা করা উচিত নয়। তাদের কথার মাঝে হুট করে উপস্থিত হয়ে যাওয়াও উচিত নয়।

১৮. কেউ কথা বললে, পুরোটা না শুনেই জবাব না দেয়া। তার কথার মাঝে কথা বলে না ওঠা। তাকে কথা শেষ করতে দেয়া।

১৯. নিজের গোপন কথা অন্যের কাছে না বলাই নিরাপদ। অতি আপজনন হলেও না। আজ আপন, কাল পর হবে না, তার নিশ্চয়তা আছে?

২০. কথা বলার আগে ভেবে নেওয়া উচিত, কথাটা প্রাসঙ্গিক কি না।

প্রসঙ্গ ছাড়া কথা না বলাই উত্তম।

ফোন-মোবাইল ব্যবহারের আদাব

১. কল করার আগে দেখে নিবো, ওপাশে নামায-জামাতের সময় চলছে কি না। সময় হলে পরে কল করব।
২. প্রথমে হ্যালো না বলে, সালাম দিবো।
৩. পূর্বপরিচিত না হলে, প্রথমে সালাম দিয়ে পরিষ্কার করে সংক্ষেপে নিজের পরিচয় দিবো।
৪. যাকে কল করছি, তার বিশ্রাম, ব্যস্ততার সময় জেনে নিবো। জানতে না পারলে কথার শুরুতেই জেনে নিবো, এখন কথা বলা যাবে কি না?
৫. শ্রোতার বুঝতে সমস্যা না হয়, এমন ভঙ্গি ও গতিতে কথা বলব। ধীরে ধীরে স্পষ্ট উচ্চারণে কথা বলব। নেটওয়ার্ক দুর্বল থাকলে, ওপাশ থেকে আমার কথা শোনা যাবে না, বোঝা যাবে না, এটাও খেয়াল রাখা উচিত।
৬. কথা দীর্ঘ করতে হলে আগেই অনুমতি চেয়ে নেওয়া উচিত। কোনে বিষয়ে কথা বলতে চাই, সেটাও আগে জানিয়ে দেয়া ভালো।
৭. ওপাশ থেকে ব্যস্ত বললে,পরে কথা বলার কথা জানালে, কিছু মনে না করে মেনে নেয়া। কথা বলার জন্য জোরাজুরি না করা।
৮. উদ্দিশ্যহীন, অপ্রয়োজনীয় কথা না বলা।
৯. কথাবার্তায় নম্রভদ্র ভঙ্গি ব্যবহার করা।
১০. ওপাশ থেকে দীর্ঘ কথা বলতে থাকলে, এপাশ থেকে 'জি, হাঁ, আচ্ছা, বলে নিজের উপস্থিতি জানান দেয়া উচিত। যাতে অপরপক্ষ এপাশের উপস্থিতি নিয়ে সন্দেহে পড়ে না যায়। সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, ওপাশে থাকা ব্যক্তি কথায় মনোযোগ

দিচ্ছে না, এমন চিন্তা না আসে।

১১. মসজিদে মোবাইল ব্যবহার যতটা সম্ভব সীমিত করা। মোবাইলে দুনিয়াবি কথা না বলা। অতি প্রয়োজন ছাড়া কল না করা।

১২. মাহফিল-মজলিসে থাকাবস্থায় কল এলে, একপাশে সরে গিয়ে অনুচ্চ স্বরে কথা বলা।

১৩. মসজিদে প্রবেশের আগেই মোবাইল বন্ধ বা সাইলেন্ট করে নেয়া।

১৪. জামাত চলাকালে রিংটোন বেজে উঠলে, হাত দিয়ে দ্রুত রিংটোন বন্ধ করে দেয়া উচিত। কেউ বন্ধ করতে না পারলে, নামাজশেষে সবাই একযোগে তার ওপর বাক্যবাণ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত নয়। একজন সুন্দর করে বুঝিয়ে বললেই হবে। সবচেয়ে ভালো হয়, ইমাম সাহেব মাঝেমধ্যে মোবাইলের আদব নিয়ে কথা বললে।

১৫. কল রেকর্ড করতে চাইলে, অপরপক্ষ থেকে অনুমতি নেওয়া উচিত। অনুমতি ছাড়া কল রেকর্ড করা উচিত নয়।

১৬. আশেপাশের লোকজনকে কথা শোনানোর জন্য স্পিকার অন করলে, অপরপক্ষকে জানিয়ে দেয়া উচিত। শ্রোতা কারা, সেটাও জানানো উচিত, তাহলে কথাবার্তায় সাবধান হতে পারবে। কনফারেন্স কলের ক্ষেত্রেও এই বিষয়গুলো লক্ষ্য করা উচিত।

১৭. গান বা গানের মিউজিককে রিংটোন হিসেবে ব্যবহার করা উচিত নয়। যতজন রিংটোন শুনবে, সবার গুনাহের বোঝা চাপবে। আর নামাযের সময় মসজিদে গানের রিংটোন বেজে ওঠার মতো ভয়াবহ ব্যাপার আর হতে পারে না।

১৮. কুরআনের আয়াতকেও রিংটোন হিসেবে ব্যাবহার করা উচিত নয়। এতে কুরআনের অমযাদা হয়, বেআদবি হয়। মাঝেমধ্যে এমন জায়গায় কল বেজে ওঠে, যেখানে কুরআনের আয়াত

তিলাওয়াত অসমীচিন। কলরিসিভ করার জন্য আয়াতের মাঝামাঝিতে কেটে দিতে হয়, এটাও বেমানান।

১৯. ওলামায়ে কেরাম নাতে রাসুলও রিংটোন হিসেবে ব্যবহার করতে নিষেধ করে। সাধারণ গজল রিংটোন হতে পারে।

২০. কুরআনের আয়াত ম্যাসেজ করে পাঠাতে চাইলে, আরবিতে লেখা উচিত। অন্য কোনো ভাষার অক্ষরে কুরআনের আয়াত লেখা উচিত নয়। হাঁ, কুরআনের তরজমা নিজের ভাষায় লেখা যেতে পারে।

২১. হাদীসও আরবি ছাড়া অন্য কোনো ভাষার অক্ষরে লেখা উচিত নয়। কারণ এতে হাদীসের শব্দ ভুল পড়ার আশংকা থাকে। যে কোনো ভাষায় হাদীসের তরজমা লেখা যেতে পারে।

২২. কুরআন ও হাদীসের বাণী সম্বলিত এসএমএস যাচাই না করে লেখা উচিত নয়। এমন মেসেজ নিজের মোবাইলে এলে, ভালোমতো যাচাই না করে ফরোয়ার্ড করা উচিত নয়।

২৩. কুরআনের আয়াত ও হাদীসের ম্যাসেজ পড়ার পর ডিলিট করে দিতে কোনো সমস্যা নেই।

২৪. কাউকে কল করার পর রিসিভ না হলে, বারবার পরপর কল করে বিরক্ত করা উচিত নয়। অন্তত একবার কল করার পর, দ্বিতীয়বার কল করার আগে চার রাকাত নামায আদায় পরিমাণ বিরতি দেয়া উচিত।

২৫. মোবাইল স্ক্রীনে কুরআন খুললে, ছোঁয়ার আগে ওজু করে নেওয়া উচিত।

চিঠিপত্রের আদাব

১. চিঠির শুরুতে বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম লিখব।

২. যার কাছে চিঠি লিখছি, তার অবস্থান, মযাদা ঠিক রেখে সম্বোধন

করব। জনাব, মুহতারাম, স্যার ইত্যাদি।

৩. যার কাছে চিঠি লিখছি, তার নাম ও সম্বোধনের পর বিসমিল্লাহির রহমানি রহীম লেখা উচিত। কুরআনের অনুসরণে।

৪. হাই, হ্যালোজাতীয় শব্দগুলো সালামের বিকল্প হতে পারে না। এগুলো পরিহার করা ভালো।

৫. চিঠির ভাষা অত্যন্ত সহজসরল আর স্পষ্ট হওয়া উচিত। পাঠক যেন সহজেই আমার কথা বুঝতে পারে।

৬. অনুমতি ছাড়া অন্যের চিঠি পড়া উচিত নয়। এ ধরণের অভ্যেস পরিহারযোগ্য। নিচু মনের পরিচায়ক। এটা বিশ্বাসঘাতকতার শামিল।

৭. চিঠির শব্দ ও ভাষা নির্বাচনে সতর্ক থাকা কাম্য। অসমীচিন, অশোভন শব্দবাক্য পরিহার করা উচিত। উস্কানিমূলক, শ্লেষাত্মক, বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিও পরিহারযোগ্য। চিঠিতে রাগক্রোধ জাহির করাও অনুচিত। চিঠি হবে ভদ্রতাপূর্ণ, ভারসাম্যপূর্ণ।

৮. নিরক্ষর কোনো ব্যক্তি আমাকে দিয়ে চিঠি লেখাতে চাইলে, আমানতদারিতার সাথে তার চিঠি লিখে দেয়া উচিত। প্রেরকের অনুমতি ছাড়া নিজের পক্ষ থেকে বাড়তি কোনো কথা বা বাক্য যোগ করা উচিত নয়। প্রেরক যদি বলে, আপনার মতো করে লিখে দিন, তাহলে ঠিক আছে। সেক্ষেত্রে চিঠি লেখা সম্পন্ন করার পর, প্রেরককে একবার পড়ে শোনানো উচিত।

৯. আমাকে দিয়ে কেউ নিজের কোনো গোপন কথা লেখালে, সেকথা অন্য কারো কাছে ফাঁস করা উচিত নয়।

১০. মাঝেমধ্যে নিজের দোস্ত-আহবাব, প্রিয়জন, আত্মীয়-স্বজনকে চিঠি লিখে নিজের খবরাখবর জানানো যেতে পারে। তাদের খোঁজখবর জানার জন্যও চিঠি লিখতে পারি। মোবাইল-ইন্টারনেটের যুগেও চিঠির আশ্রয় নিতে পারি।

১১. চিঠির শেষে নিজের নাম ও তারিখ স্পষ্ট অক্ষরে লিখে দেয়া উচিত।

১২. খামের ওপর প্রাপকের নাম, ঠিকানা, ফোন নাম্বার স্পষ্ট অক্ষরে লেখা উচিত।

১৩. কাউকে নিজের প্রয়োজনে চিঠি লিখলে, চিঠির সাথে জবাব পাঠানোর খাম, কাগজ, ডাকটিকেটও পাঠানো উচিত। ফিরতি খামের ওপর নিজের নাম, ঠিকানা, ফোন নাম্বার লিখে দেয়া উচিত।

১৪. প্রয়োজন ছাড়া চিঠি লেখা উচিত নয়।

বিসমিল্লাহ

ই-মেইল ও ম্যাসেজের আদাব

---

১. ই-মেইল ম্যাসেজের ক্ষেত্রেও চিঠিপত্রের আদবগুলো লক্ষ্য রাখব। একসাথে অনেক মেসেজ-মেইল পাঠাব না। মেসেজ-মেইল পাঠানোর পর সাথে সাথে রিপ্লাই না এলে, অপেক্ষা করব। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরও জবাব না এলে, স্মরণ করিয়ে দেয়া যেতে পারে।

২. কোনোদিক থেকে তথ্য বা বিনোদনমূলক মেসেজ এলে, চিন্তাভাবনা না করেই সেটাকে অন্য কোনো নাম্বারে ফরোয়ার্ড করে দিব না। মানুষ বিরক্ত হয়। বিরক্ত না হলে সমস্যা নেই।

৩. বিরক্তিকর লেখা, ছবি, অডিও, ভিডিও অন্যকে পাঠাব না।

৪. অশ্লীল, অশালীন কোনো লেখা, ছবি, অডিও, ভিডিও অন্যকে পাঠাব না। আমাকে কেউ পাঠালে সাথে সাথে ডিলিট করে দিব। নিষেধ করার পরও কেউ বারবার এমন কিছু পাঠালে ব্লক করে দিব।

৫. যাদের কাছে আমার ই-মেইল এড্রেস নেই, তাদের কাছে পাঠানো

মেসেজের শুরুতে সালাম দিয়ে নিজের পরিচয় দিবো। মেসেজের উদ্দেশ্য বলব।

৬. অন্যের মোবাইল, পিসি, ল্যাপটপ, গ্যাজেট ব্যবহার করলে, তার পারসোনাল ডাটায় ঢুকব না। গ্যালারির ছবি দেখব না, মেইল, মেসেজ খুলে দেখব না।

৭. কারো মেসেজ-মেইল তার অনুমতি ছাড়া অন্যের কাছে ফরোয়ার্ড করব না।

সোশ্যাল মিডিয়ার আদব

১. সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের আগে নিজের উদ্দেশ্য ঠিক করে নিব। আমি কেন সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করছি, এটা যেন আমার কাছে পরিষ্কার থাকে।

২. সোশ্যাল মিডিয়াকে ইতিবাচক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করব। নেতিবাচক কাজে ব্যবহার করব না।

৩. ইউটিউব, ফেসবুক, এক্স, ওয়াটসএ্যাপ ইত্যাদিতে নিজের নামে আইডি হোক বা ফেইক হোক, শরিয়তবিরোধী কিছু করব না। দেশ, জাতি ও সমাজের ক্ষতিকর কিছু করব না। কোনো কথা প্রচার করব না। এমন কোনো কর্মকাণ্ডের সাথে জড়াব না।

৪. যাকেতাকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাব না। একদম অপরিচিত কাউকে ফ্রেন্ডলিস্টে স্থান দিবো না। ফেক আইডির সাথে মেসেজ চালাচালির ক্ষেত্রে সতর্ক থাকব।

৫. গাইরে মাহরামকে ফ্রেন্ডলিস্টে স্থান দিব না। সন্দেহজনক কাউকে ফ্রেন্ডলিস্টে রাখব না। শরিয়তবিরোধী, দেশ ও জাতির শত্রুকে ফ্রেন্ডলিস্টে রাখব না। হিংসা-বিদ্বেষ, অশ্লীলতা ছড়ানো ব্যক্তিকে ফ্রেন্ডলিস্টে রাখব না। এমন ব্যক্তিকে ব্লক করে দিব।

৬. সোশ্যাল মিডিয়াতে ব্যক্তিগত তথ্য, ছবি, ভিডিও শেয়ার করা

থেকে বিরত থাকব।

৭. অন্যের প্রাইভেসির দিকে লক্ষ্য রাখব। কারো গোপন কথা, তথ্য সোশ্যাল মিডিয়াতে প্রকাশ করে দিব না। ভিউ, লাইক, শেয়ার কামানোর জন্য অমানুষ হয়ে যাবো না।

৮. কারো কমেন্টবক্সে গিয়ে ঝগড়া শুরু করে দিব না। নিজের কমেন্টবক্সেও ঝগড়া করব না। কারো কোনো কথা ভালো না লাগলে এড়িয়ে যাবো। শরিয়তবিরোধী কিছু হলে শালীন, যৌক্তিক ভাষায় প্রতিবাদ করব।

৯. ব্যক্তিগত আইডি হ্যাক হয়ে গেলে, সাথে সাথে অন্য কোনো মাধ্যম ব্যবহার করে বিষয়টি প্রচার করে দিব। যাতে আমার হ্যাকড আইডি ব্যবহার করে হ্যাকার অন্য কারো ক্ষতি করতে না পারে। আমার আইডি থেকে অপ্রীতিকর কিছু প্রচারিত হলেও পরিচিতজনরা সতর্ক থাকতে পারবে।

১০. উপকারী চ্যানেল, গ্রুপ, পেজের সাথে যুক্ত থাকব। শুধু সময় কাটানোর জন্য সোশ্যাল মিডিয়াতে আসব না।

১১. সোশ্যাল মিডিয়াতে শুধু নির্ভরযোগ্য আলিমের ওয়াজ-নসিহত শুনব। নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির কাছ থেকে ইলম গ্রহণ করব। বাতিল দল, ভ্রান্ত আকীদার লোকদের এড়িয়ে চল। তাদের সাথে তর্কে জড়াব না।

১২. নির্ভরযোগ্য আলিমের বক্তব্য, পোস্ট শেয়ার করব। বিতর্কিত ব্যক্তির কথা, লেখা শেয়ার করব না।

১৩. যথাসম্ভব বৈধ সফটওয়্যার, এ্যাপ ব্যবহার করব। অনুমতিবিহীন সফট্যওয়ারগুলো কিনে ব্যবহার করার চেষ্টা করব।

১৪. সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে ব্যবসা করার মূলনীতিগুলো জেনে নিব। অভিজ্ঞ মুফতি সাহেবের সাথে কথা মাসালা জেনে নিব। নাজায়েজ কাজ থেকে বিরত থাকব।

পরামর্শের আদাব

পরামর্শ গ্রহণের আদাব

১. কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ সামনে এলে, বড় কোনো প্রকল্পে হাত দেয়ার আগে, কোনো সমস্যা দেখা দিলে, জরুরি কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার প্রয়োজন পড়ে, মুশাওয়ারা-পরামর্শ করা সুন্নত। পরামর্শের মাধ্যমে ভিন্নমুখী চিন্তা সামনে আসে। ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সুবিধা হয়।

২. অন্যের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করতে মোটেও লজ্জাবোধ করব না। পরামর্শ গ্রহণ করলে লোকে কী বলবে, আমার মানইজ্জত কমে যাবে, এমন চিন্তা করা ভুল।

৩. কারো কাছে পরামর্শ চাইতে গেলে, তার সামনে পুরো সুরতহাল স্পষ্ট করে খুলে বলব। কোনো কিছু অস্পষ্ট রাখব না। তাহলে পরামর্শদাতা সবদিক বিবেচনা করে, ভেবেচিন্তে পরামর্শ দিতে পারবেন। আমি কথা লুকালে বা অস্পষ্ট রেখে দিলে, ভুল পরামর্শ আসার আশংকা থাকবে।

৪. পরামর্শদাতার কথা পরিপূর্ণ মনোযোগের সাথে শুনব। তাড়াহুড়া না করে প্রাপ্ত পরামর্শ নিয়ে চিন্তাভাবনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব।

৫. বয়েসে বা পদমযাদায় ছোট কেউ পরামর্শ দিলে অবহেলা না করে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করব। যৌক্তিক আর গ্রহণযোগ্য মনে হলে সাদরে গ্রহণ করে নিব।

৬. বড় আর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যেমন পরামর্শ গ্রহণ করা সুন্নত, দৈনন্দিন জীবনের ছোটখাট বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ করাও তাই।

৭. অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছে পরামর্শ চাইব। আমার প্রতি মহব্বত রাখে এমন ব্যক্তিকে প্রাধান্য দিব।

পরামর্শ দেয়ার আদাব

১. কাওকে যেচে পরামর্শ দেয়া উচিত নয়। আন্তরিকভাবে আগ্রহের সাথে পরামর্শ চাইলে তবেই পরামর্শ দেয়া ভালো।

২. পরামর্শ এক প্রকার আমানত। আমানতদারিতার সাথে পরামর্শ দেয়ার চেষ্টা করব। পরামর্শের কথা তৃতীয় কাউকে জানাব না। পরামর্শ দেয়ার সময় ব্যক্তিগত স্বার্থ বা উদ্দেশ্য থেকে মুক্ত হয়ে নিব।

৩. পরামর্শ দেয়ার সময় ব্যক্তিগত মেজায, অভিরুচি, বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গি, কটাক্ষ, শ্লেষ, অবজ্ঞাসূচক ভঙ্গি পরিত্যাগ করব। শান্ত আর আন্তরিক ভঙ্গিতে পরামর্শের বক্তব্য তুলে ধরব। আত্মবিশ্বাস নিয়ে কথা বলব।

৪. পরামর্শ দেয়ার সময় নিজেকে বড়, পরামর্শগ্রহণকারীকে ছোট ভাবব না। উৎসাহ আর প্রেরণা দানের ভঙ্গিতে কথা বলব।

৫. আমার আগে অন্য কারো কাছে পরামর্শ করলে, সেটাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করব না। আমার পরে অন্য কারো পরামর্শ করলে সেটা নিয়ে কিছু বলব না, মনেও করব না।

৬. পরামর্শ স্পষ্ট ও গোছালো ভাষায়, আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গিতে প্রকাশ করব। শ্রোতা আমার পরামর্শ ভালো করে বুঝতে পারল কি না, সেটা নিশ্চিত হয়ে নিব।

৭. পরামর্শ উপস্থাপন করার পর, আমার পরামর্শ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য চাপাচাপি করব না। আমার পরামর্শ গ্রহণ না করলে রাগ দেখাব না। আমার পরামর্শ গ্রহণ করে কাজ শুরু করলে, সেটা নিয়ে গর্ব করব না। খোঁটা দিব না। বলে বেড়াব না।

৮. আগেরবার আমার দেয়া পরামর্শ গ্রহণ করেনি, এ কারণে পরেরবার পরামর্শ চাইতে এলে উপেক্ষামূলক আচরণ করব না।

৯. একসাথে কয়েকজন বসা থাকাবস্থায় কেউ পরামর্শ চাইলে, যিনি বড় তাকে পরামর্শ দেয়ার সুযোগ দেয়া। বয়েসে বা পদে ছোট কারো

কিছু বলার থাকলে, বড়দের অনুমতি নিয়ে মুখ খোলা। বৈঠকে তিনচার রকমের পরামর্শ এলে, আমার পরামর্শ গৃহীত হলে উল্লসিত হবো না, গৃহীত না হলে ক্ষুন্ন হবো না।

সুপারিশের আদাব

১. প্রয়োজনগ্রস্ত ব্যক্তি আমাকে তার জন্য কারো কাছে সুপারিশ করার অনুরোধ করলে, সাধ্যমতো চেষ্টা করব। অন্যের ভালোর জন্য সুপারিশ করা অনেক বড় সওয়াবের কাজ।

২. শুধু আল্লাহ তাআলাকে রাজিখুশি করার জন্য সুপারিশ করব; দুনিয়াবি প্রাপ্তির জন্য নয়। আমার ওপর মুমিন ভাইয়ের হক মনে করে সুপারিশ করব। সুপারিশ করে তার প্রতি অনুগ্রহ করছি, এমন চিন্তা ঘুনাক্ষনেও মনে ঠাঁই দিবো না।

৩. যে কাজের জন্য আমাকে সুপারিশ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে, সেটা শরিয়ত অনুমোদিত কিনা, যাচাই করে দেখব। অন্যায়কাজে সুপারিশ করব না।

৪. যেসব কাজে জড়ালে শরিয়ত শাস্তি নির্ধারণ করেছে, তেমন কাজে সুপারিশ করব না। যেমন চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার, অপবাদ ইত্যাদির ক্ষেত্রে সাজা কমানোর সুপারিশ করব না।

৫. একজনকে বঞ্চিত করে আরেকজনকে অন্যায় সুবিধা পাইয়ে দেয়ার জন্য সুপারিশ করব না।

৬. সুপারিশ করার পরও গৃহীত না হলে, এ নিয়ে মন খারাপ করব না, উচ্চবাচ্য করব না। মনে রাখব, সুপারিশ একধরণের পরামর্শ। গ্রহণ করা না করার এখতিয়ার আছে। আমার দেয়া পরামর্শ গ্রহণ না করলে মনখারাপ করা বা রাগ করা উচিত নয়।

৭. সুপারিশটা এমন হওয়া উচিত, আমার সুপারিশ গ্রহণ করতে গেলে যাতে কোনো নিয়ম ভঙ্গ করতে না হয়। আমার সুপারিশ গ্রহণ করাটা বোঝা না হয়ে যায়।

৮. সুপারিশ করে বিনিময় গ্রহণ করব না। সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হয়ে সুপারিশ করব।

হাসি-গল্পের আদাব

১. যারা রসিকতা পছন্দ করে, তাদের সাথে হাস্য-রসিকতা করা উচিত। আমার রসিকতায় বিরক্ত হওয়ার আশংকা থাকলে, নিবৃত্ত থাকা উচিত।

২. রসিকতার মাত্রা সীমিত রাখা উচিত। অতিমাত্রায় রসিকতায় হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৩. হাস্য-পরিহাসে অতিরিক্ত হাসি, অট্টহাসি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাজ্য। বেশি হাসলে অন্তর মরে যায়।

৪. পরিবেশ, পরিস্থিতি বুঝে রসিকতা করা উচিত। ব্যক্তির মেজাজমর্জি বুঝে রসিকতা করা উচিত। বৈঠক-মজলিসের ধরণ বুঝে রসিকতা করা উচিত। ভাবগাম্ভীযপূর্ণ মজলিসে হালকা আচরণ পরিহারযোগ্য।

৫. শরিয়তের সীমায় থেকে রসিকতা করা উচিত। শরিয়তবিরোধী কথা, কাজ, আচরণ দিয়ে রসিকতা করব না। রসিকতা করতে গিয়ে মিথ্যা বলব না, গালিগালাজ করব না, অপবাদ দিব না, ভর মজলিসে কাউকে হেয়-খাটো করব না। কারো সম্মান, সম্পদ, বংশ নিয়ে হাসিঠাট্টা করব না।

৬. হাসিগল্পের বৈঠকে অশ্লীল, অশোভন গল্প বলব না।

৭. নিছক হাসির জন্য রসিকতা না করা। হাসির আড়ালে যেন শিক্ষা ও চিন্তার উপকরণ থাকে, সেদিকে লক্ষ্য রাখা। ব্যক্তিত্বকে খাটো করে, এমন রসিকতা করা উচিত নয়।

৮. রসিকতা করতে গিয়ে, অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করব না।

৯. কাউকে হাসতে দেখলে বলব (أَضْحَكَ اللهُ سِنَّكَ) আল্লাহ আপনাকে হাসিখুশি রাখুন।

আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষার আদাব

১. আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করব, তাদের সাথে উত্তম আচরণ করব।

২. দুনিয়াবি লাভের উদ্দেশ্যে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করব না। আত্মীয়-স্বজনকে দান-দাক্ষিণা করলে, তারা আমার প্রতি অনুগত থাকবে, আমার বিপদে পাশে দাঁড়াবে, এমন উদ্দেশ্য মনে রাখব না।

৩. আত্মীয়-স্বজন আমার সাথে মন্দ আচরণ করলেও, আমি আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষায় পিছপা হবো না।

৪. আত্মীয়-স্বজনের অভাব-চাহিদার প্রতি খেয়াল রাখব। দুর্দিনে তাদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করব।

৫. প্রথমে একেবারে নিকটাত্মীয়ের প্রতি দরদী হবো, তারপর পযায়ক্রকে দূরের আত্মীয়ের প্রতি।

৬. আত্মীয়-স্বজন অন্যায় আচরণ করলেও, আত্মীয়তার দাবি হল, আমি তার সাথে উত্তম আচরণ করব। মন্দের বদলে মন্দ আচরণ করব না।

৭. আত্মীয়-স্বজনকে ভালো কাজের আদেশ করব, মন্দ কাজে নিষেধ করব। এটাও আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষার দাবি। কাজটা হেকমত ও বুদ্ধিমত্তার সাথে করব। হুকুমের স্বরে কথা বলব না।

৮. আত্মীয়-স্বজনের সুখেদুঃখে তাদের পাশে থাকার চেষ্টা করব। তারা শরিয়তবিরোধী কাজে লিপ্ত থাকলে, নরম ভাষায় বিরত রাখার চেষ্টা করব। বোঝানো অব্যাহত রাখব। তাদের জন্য দোয়া করতে থাকব।

চতুর্থ অধ্যায়

যাপিত জীবন

শোয়ার আদাব

১. শোয়ার আগে ঘরের দরজা-জানলা বিসমিল্লাহ বলে বন্ধ করব।
২. শোয়ার আগে অপ্রয়োজনীয় পাখা, বাতি, আগুন, চুলা বন্ধ করব।
৩. এশার পর তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলব। প্রয়োজন ছাড়া শুতে বিলম্ব করব না।
৪. শোয়ার আগে বিছানা ঝেড়ে নিব।
৫. মানসুন আমল ও দোয়া পড়ে শুতে যাবো। আয়াতুল কুরসি, সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত, তিনবার সূরা কাফিরূন পড়ে নিব।
৬. শোয়ার আগে 'আল্লাহুম্মা বিসমিকা, আমুতু ওয়া আহইয়া' পড়ব। হে আল্লাহ, আপনার নামে ঘুমাই ও জাগ্রত হই।
৭. শোয়ার আগে তিনবার করে সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাস পড়ে দুই হাতের তালুতে ফুঁ দিব। দুই তালু পুরো শরীরে মুছে নিব।
৮. শোয়ার আগে তাওবা করে নিব।
৯. শোয়ার আগে তাহাজ্জুদে ওঠার পাক্কা নিয়ত করব। তাহাজ্জুদ পড়বই ইন শা আল্লাহ।
১০. শোয়ার আগে সবাইকে মাফ করে দিব। কারো প্রতি মনে সামান্যতম হিংসা-বিদ্বেষ রাখব না। মনকে সম্পূর্ণ পাকসাফ করে শুবো।
১১. ডানকাত হয়ে শুবো। চেহারা কেবলামুখি রাখার চেষ্টা করব। উত্তর-দক্ষিণ হয়ে শোয়ার চেষ্টা করব। মাথা উত্তর দিকে, পা দক্ষিণ দিকে। বিছানায় মাথা রেখে তিনবার পড়ব,

اللهُمَّ قِنِيْ عَذَابَكَ يَومَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ

হে আল্লাহ, যেদিন আপনি সবাইকে পুনর্জীবিত করবেন,
সেদিন আমাকে আপনার আযাব থেকে রক্ষা করুন।

১২. শোয়ার পরও ঘুম আসতে না চাইলে এই দোয়া পড়ব,

اللَّهُمَّ غَارَتِ النُّجُومُ، وَهَدَأَتِ الْعُيُونُ، وَأَنْتَ حَيٌّ قَيُّومٌ، لَا تَأْخُذُكَ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ، يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ، أَهْدِئْ لَيْلِي وَأَنِمْ عَيْنِي

হে আল্লাহ! তারকারা ঢাকা পড়ে গেছে, চোখগুলো নিস্তব্ধ হয়ে গেছে, আর আপনি চিরঞ্জীব, সবকিছুর ধারক ও নিয়ন্তা। আপনাকে না ঘুম পায়, না তন্দ্রা। হে চিরঞ্জীব ও সর্বসত্তার ধারক! আমার রাতকে শান্ত করুন এবং আমার চোখে ঘুম এনে দিন।

১৩. দুঃশ্চিন্তা ও মানসিক অশান্তির কারণে ঘুম না এলে পড়ব,

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ، وَشَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، وَأَنْ يَحْضُرُونِ

আমি আল্লাহর পূর্ণ শব্দগুলোর আশ্রয় চাই, তাঁর ক্রোধ, শাস্তি, তাঁর বান্দাদের অনিষ্ট, শয়তানদের কুমন্ত্রণা এবং তাদের উপস্থিতি থেকে।

১৪. ভালো স্বপ্ন দেখলে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করব। বারবার 'আলহামদুলিল্লাহ' বলব।

১৫. দুঃস্বপ্ন দেখলে শোয়াবস্থাতেই বামদিকে ফিরে তিনবার থুথু ফেলার ভান করব। ডানকাত হয়ে শুবো। তিনবার পুরো আউযুবিল্লাহ পড়ব।

১৬. খারাপ স্বপ্ন কারো কাছে বলব না। সম্ভব হলে ঘুম থেকে জাগার পর ওজু করে দুই রাকাত নামায পড়ে যাবতীয় অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছি পানাহ চাইব। সাধ্যমতো সদকা করে দিব।

১৭. যারতার কাছে স্বপ্নের তাবীর জানতে চাইব না, যাকেতাকে স্বপ্নের বিবরণ শোনাব না। স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কে অভিজ্ঞ ও আমার প্রতি আন্তরিক ব্যক্তির কাছে বলা যেতে পারে।

১৮. দুপুরে খাবার গ্রহণের পর সম্ভব হলে কাইলুলাহ করব। কাইলুলাহ মানে চোখ বন্ধ করে চুপচাপ একটু শুয়ে থাকা।

১৯. হাতে খাবারের চর্বি, তেলজাতীয় কিছু লেগে থাকলে শোয়ার আগে ভালো করে ধুয়ে নিব।

২০. উপুড় হয়ে শয়ন করব না।

২১. খোলা আকাশের নিচে, খোলা ছাদে শয়ন করব না। রাতের বেলা গাছের নিচে শয়ন করব না। আড় ছাড়া দুই নারী বা দুই পুরুষ একই বিছানায় না শোয়া ভালো। একই কাঁথা-লেপও দুজন ব্যবহার করা উচিত নয়। একান্ত বাধ্য হলে ভিন্নকথা।

২২. উন্মুক্ত স্থানে, রাস্তাঘাটে, ভর মজলিসে, হাঁটাচলার স্থানে শয়ন করব না। মসজিদের মাঝামাঝিতে, মিম্বরের কাছে একাকি শুয়ে থাকব না। প্রয়োজন হলে একপাশে গিয়ে শয়ন করব।

জাগ্রত হওয়ার আদাব

১. ভোরে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ব। এজন্য আগে আগে শুয়ে পড়ব। ঘুম বেশি ভারী হলে, এলার্ম দিয়ে শুবো।

২. ঘুম ভাঙার পর দুইহাত দিয়ে আলতো করে দুচোখ মুছব। পুরো মুখমণ্ডল আলতো করে মলে নিব।

৩. ঘুম থেকে ওঠার পর দোয়া পড়ব,

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদের মৃত্যুর (ঘুমের) পর পুনরায় জীবিত করলেন এবং তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন।

৪. ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর দুইহাত ধুয়ে নিব।

৫. মিসওয়াক করব।

৬. জাগ্রত হওয়ার পর সূরা আলে ইমরানের শেষ রুকু তিলাওয়াত করব।

৭. গোসলের প্রয়োজন থাকলে তাড়াতাড়ি সেরে নিব। গোসলের কারণে কোনো অবস্থাতেই যাতে নামায বাদ না যায়, সেদিক সর্বোচ্চ দৃষ্টি রাখব।

পোশাক-পরিচ্ছদের আদাব

১. পোশাক আল্লাহ তাআলার নেয়ামত। পোশাকের জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করব।

২. পাকপবিত্র পোশাক পরব। অপবিত্র পোশাক পরিহার করব।

৩. পরিচ্ছন্ন পোশাক পরব। অপরিচ্ছন্ন পোশাক বর্জন করব।

৪. অমুসলিমসুলভ পোশাক পরব না।

৫. নারী-পুরুষ একে অপরের মতো পোশাক পরব না।

৬. পোশাক পরতে ডানদিক, খুলতে বামদিক প্রাধান্য দিব।

৭. নতুন পোশাক জুমার দিন থেকে পরা শুরু করা যেতে পারে।

৮. নতুন পোশাক পরার সময় বিসমিল্লাহ বলে এই দোয়া পড়ব,

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ، أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ

আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু আন্তা কাসাওতানীহি, আসআলুকা খাইরাহু ওয়া খাইরা মা সুনিআ লাহু, ওয়া আউযু বিকা মিন শাররিহি ওয়া শাররি মা সুনিআ লাহু।

হে আল্লাহ! সকল প্রশংসা আপনারই জন্য। আপনিই আমাকে এ পোশাক পরিয়েছেন। আমি এর কল্যাণ ও যেসব কারণে এটি তৈরি হয়েছে তার কল্যাণ চাই। আর আমি এর অনিষ্ট ও যেসব কারণে এটি তৈরি হয়েছে তার অনিষ্ট থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাই।

৯. পুরনো কাপড় সদকা করে দিব।

১০. অন্যকে নুতন কাপড় পরতে দেখলে বলব,

تُبْلِيْ وَيُخْلِفُ اللهُ تَعالَى، اِلْبَسْ جَدِيْدًا وَعِشْ حَمِيْدًا وَمُتْ شَهِيْدًا

তুবলী ওয়া ইউখলিফুল্লাহু তাআলা, ইলবাস জাদীদান, ওয়া ইশ হামীদান ওয়া মুত শাহীদান।

তুমি এই পোশাক পরতে পরতে পুরোনো করো, আর আল্লাহ তাআলা তোমাকে এর পরিবর্তে আরও ভালো পোশাক দান করুন। তুমি নতুন পোশাক পরো, সুন্দর-প্রশংসিত জীবন যাপন করো এবং শহীদ অবস্থায় মৃত্যু বরণ করো।

১১. পোশাক পরা ও খোলার সময় বিসমিল্লাহ বলব।

১২. শরীর দেখা যায়, নারীগণ এমন পোশাক বর্জন করবেন।

১২. ছবিযুক্ত পোশাক পরিহার করব।

জুতা পরার আদাব

১. জুতো পায়ে দেয়ার আগে নিশ্চিত হয়ে নিব, জুতোর মধ্যে ক্ষতিকর কিছু নেই।

২. ডানপায়ের জুতো আগে পরব, বামপায়ের জুতো আগে খুলব।

৩. জুতো বহন করতে হলে বামহাতে নিব।

৪. দাঁড়িয়ে সু-জুতো পরতে গেলে পড়ে যাওয়ার আশংকা থাকলে, বসে পরাই নিরাপদ।

৫. অন্যের জুতো পরার প্রয়োজন দেখা দিলে, অনুমতি ছাড়া না পরা।

৬. নিজের সামর্থ অনুযায়ী জুতো কিনব। সামর্থের অতিরিক্ত দাম দিয়ে জুতো কিনব না।

৭. জুতোর উপরনিচ পরিস্কার রাখব।

৮. ছেঁড়া জুতো পরব না।

৯. ওয়াশরুমের জন্য আলাদা জুতো ব্যবহার করব।

ঘর থেকে বের হওয়ার আদাব

১. ঘর থেকে বের হওয়ার সময় পড়ব,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ، أَوْ أُضَلَّ، أَوْ أَزِلَّ، أَوْ أُزَلَّ، أَوْ أَظْلِمَ، أَوْ

أُظْلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ، أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ

আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযু বিকা আন আদিল্লা আও উদল্লা, আও আযিল্লা আও উযাল্লা, আও আঝলিমা আও উঝলামা, আও আজহালা আও ইয়ুঝহালা আলাইয়া।

হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় চাই তোমার কাছে— আমি যেন পথভ্রষ্ট না হই বা কাউকে পথভ্রষ্ট না করি, আমি যেন ভুল না করি বা অন্যকে ভুল না করাই,

আমি যেন জুলুম না করি বা আমার ওপর জুলুম না করা হয়, আমি যেন মূর্খতা না করি বা আমার সঙ্গে মূর্খতা না করা হয়।

بِسْمِ اللهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহি, ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

আল্লাহর নামে (ঘর থেকে বের হচ্ছি), আমি আল্লাহর ওপর ভরসা করলাম। আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোনো শক্তি ও সামর্থ্য নেই।

২. সালাম দিয়ে বের হবো।

৩. মাকরুহ ওয়াক্ত না হলে দুই রাকাত নফল পড়ে নিব।

ঘরে প্রবেশের আদাব

১. সালাম দিয়ে প্রবেশ করব।

২. প্রবেশের আগে অনুমতি নিবো, দরজায় টোকা দিব বা বেল বাজাব। আগাম সংবাদ না দিয়ে হুট করে ঘরে ঢুকে পড়ব না। নিজের ঘরেও না। হতে পারে ঘরে কোনো বেগানা নারী মেহমান এসেছেন।

৩. প্রবেশের আগে বিসমিল্লাহ বলে এই দোয়া পড়ব,

اللهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلِجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسمِ الله وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللَّهِ خَرَجْنَا، وَعَلَى اللَّهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا

আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলাকু খাইরাল মাওলিজি ওয়া খাইরাল মাখরাজি, বিসমিল্লাহি ওয়ালাজনা, ওয়া বিসমিল্লাহি খরাজনা, ওয়া আলাল্লাহি রব্বিনা তাওাক্কালনা।

হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে কল্যাণকর প্রবেশ ও কল্যাণকর বের হওয়া প্রার্থনা করছি। আল্লাহর নামে আমরা প্রবেশ করলাম, আল্লাহর নামেই আমরা বের হলাম, এবং আমাদের প্রতিপালক আল্লাহর উপরই আমরা ভরসা করলাম।

৪. ঘরে প্রবেশের আগে সম্ভব হলে মিসওয়াক করব।

৫. মাকরুহ ওয়াক্ত না হলে দুই রাকাত নফল পড়ব।

৬. দূরের সফর থেকে ফিরলে কিছুক্ষণ জিরিয়ে তারপর গোসল ও জামাকাপড় বদলানো যেতে পারে।

খাবারের আদাব

১. হালাল খাবার গ্রহণ করব। একলোকমা হারামও যেন আমার পেটে না যায়।

২. উদরপূর্তি করে খাবার গ্রহণ করব না। খাবারের চাহিদা কিছুটা বাকি থাকাবস্থায় খাবার গ্রহণ শেষ করব।

৩. পেটভর্তি থাকাবস্থায় নতুন করে খাবার গ্রহণ করব না।

৪. মানুষ চলাচলের রাস্তায় বসে খাবার গ্রহণ করব না।

৫. সোনারূপার থালাবাসনে খাবো না।

৬. ভাঙা থালাবাসনে খাবো না।

৭. কয়েকজন মিলে খাবার গ্রহণের চেষ্টা করব, তাতে খাবারে বরকত হবে।

৮. খাবারের আগেপরে হাত ধুয়ে নিবো।

৯. দস্তরখানা বিছিয়ে খাবো। যাতে বাসন থেকে নিচে পড়ে গেলে উঠিয়ে খাওয়া যায়। দাঁড়িয়ে খাবো না, বসে খাবার গ্রহণ করব।

১০. জুতো খুলে খাবার গ্রহণ করব।

১১. খাবারের শুরুতে পড়ব,

بِسْمِ اللهِ وعَلى بَرَكَةِ الله

বিসমিল্লাহি ওয়া আলা বারাকাতিল্লাহ

আল্লাহর নাম ও আল্লাহর বরকতে খাবার শুরু করছি।

১২. খাবারের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে গেলে মনে পড়ার সাথে সাথে পড়ব,

بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ

বিসমিল্লাহি আউওয়ালাহু ওয়া আখিরাহু।

আল্লাহর নামে, শুরুতেও এবং শেষেও।

১৩. খাবারের দোষ ধরব না। ভালো লাগলে খাবো, না হলে এড়িয়ে যাবো।

১৪. প্রয়োজন ছাড়া খাবার শুঁকব না।

১৫. ডানহাতে পানহার করব।

১৬. ছোট ছোট লোকমা মুখে দিব।

১৭. কয়েকজন মিলে একপ্লেটে খেলে, নিজের সামনে থেকে খাবো। হাঁ বিভিন্ন রকমের খাবার প্লেটে সাজানো থাকলে, প্রয়োজনে অন্য দিক থেকে খাবার টানতে পারি।

১৮. প্লেটের মধ্যখান থেকে খাবার খাবো না। একপাশ থেকে খাবো।

১৯. খাবার ভালোভাবে চিবিয়ে খাবো।

২০. খাবারে ফুঁ দিবো না।

২১. অতি গরম খাবার মুখে দিব না।

২২. খাবারের পর দাঁত খেলাল করে নিব।

২৩. কারো ঘরে খাবার গ্রহণ করবে, তার জন্য খাইর ও বরকতের দোয়া করব,

اللهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِيْ واسْقِ مَنْ سَقَانِيْ

আল্লাহুম্মা আতইম মান আতআমানী ওয়াসকি মান সাকানী
হে আল্লাহ, যিনি আমাকে খাবার খাইয়েছেন, আপনি তাকেও খাবার খাওয়ান, তিনি আমাকে পান করিয়েছেন, আপনি তাকেও পান করান।

أَكَلَ طَعَامَكُمُ الأَبْرَارُ وأَفْطَرَ عِندَكُمُ الصائِمُون وصَلَّتْ عَلَيْكُمُ المَلائِكَةُ

আকালা তাআমাকুমুল আবরার, ওয়া আফতারা এনদাকুমুস সায়েমুন, ওয়া সাল্লাত আলাইকুমুল মালাইয়াকহ।
পূণ্যবানগণ আপনাদের খাবার গ্রহণ করুন, রোজাদারগণ আপনাদের কাছে ইফতার করুন, ফিরিশতাগণ আপনাদের জন্য রহমতের দোয়া করুন।

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُمْ، وَاغْفِرْ لَهُمْ، وَارْحَمْهُمْ

আল্লাহুম্মা বারিক্ লাহুম ফীমা রাযাক্তাহুম, ওয়াগফির লাহুম, ওয়ারহামহুম।
হে আল্লাহ! আপনি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছেন তাতে বরকত দিন, তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং তাদের প্রতি দয়া করুন।

২৪. খাবার গ্রহণের সময় নিয়ত করব, এই খাবার থেকে যে শক্তি অর্জিত হবে, সেটা আমি আল্লাহ তাআলার হক ও বান্দার হক আদায়ে ব্যয় করব। ইন্দ্রিয়শক্তি বৃদ্ধি, শারীরিকশক্তি বৃদ্ধি, মাসলবৃদ্ধির জন্য খাবো না।

২৫. খাবার গ্রহনের সময় উত্তম আর মজার কথা বলব। অশ্লীল, অপ্রয়োজনীয় আলাপ করব না।

২৬. খাবারশেষে দোয়া পড়ব,

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا، وَرَزَقَنِيهِ، مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ

আলহামদু লিল্লাহিল্লাযি আত'আমানী হাযা, ওয়া রাযাক্বানীহি, মিন গাইরি হাওলিন মিন্নী ওয়ালা কুওওয়াহ।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাকে এ খাবার খাওয়ালেন এবং কোনো শক্তি ও সামর্থ্য ছাড়াই আমাকে তা রিযিক দিলেন।

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَ وَسَقَى، وَسَوَّغَهُ، وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا

আলহামদু লিল্লাহিল্লাযি আত'আমা ওয়া সাক্বা, ওয়া সাওয়্যাগাহু, ওয়া জা'আলা লাহু মাখরজা।

সব প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি খাওয়ালেন, পান করালেন, হজম সহজ করলেন এবং তার নির্গমনের ব্যবস্থা করলেন।

পান করার আদাব

১. বিসমিল্লাহ বলে পান করব।

২. পানি পানের আগে দেখে নেবো।

৩. বসে পান করব।

৪. ডান হাতে পান করব।

৫. পানপাত্রে নিঃশ্বাস ফেলব না।

৬. তিন নিঃশ্বাসে পান করব। প্রথম ঢোক বড় করে গ্রহণ করব। তিনঢোকের পরও তিয়াস না মিটলে বাকি পানি একসাথে পান করতে পারি। প্রতি চুমুকের আগে বিসমিল্লাহ, চুমুকের পর আলহামদুলিল্লাহ বলব।

৭. ভাঙা পানপাত্রে পান করব না।

৮. বোতলে মুখ লাগিয়ে পান করব না।

৯. পানশেষে দোয়া পড়ব,

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَقَانَا عَذْبًا فُرَاتًا بِرَحْمَتِهِ، وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِلْحًا أُجَاجًا بِذُنُوبِنَا

আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী সাক্বানা আয়্বান ফুরাতান বিরাহমাতিহি, ওলাম ইয়াজ'আলহু মিলহন উজাজান বিদুনুবিনা।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি তাঁর রহমতে আমাদেরকে মিষ্টি ও ঠান্ডা পানি পান করালেন এবং আমাদের গুনাহের কারণে একে তিক্ত-লবণাক্ত করেননি।

১০. দুধপানের পর পড়ব,

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ، وَزِدْنَا مِنْهُ

আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফিহি, ওয়া যিদনা মিনহু।

হে আল্লাহ! এতে আমাদের জন্য বরকত দিন এবং আমাদেরকে আরও বেশি দিন।

اللَّهُمَّ أَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ، وَارْزُقْنَا خَيْرًا مِنْهُ

আল্লাহুম্মা আত'ইমনা খাইরান মিনহু, ওয়ারযুকনা খাইরান মিনহু।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে এর চেয়ে উত্তম কিছু খেতে দিন এবং এর চেয়ে উত্তম কিছু রিযিক দিন।

১১. দুধ বা চর্বিযুক্ত কিছু পান করার পার ভালো করে কুলি করে নিব।

১২. একসাথে কয়েকজন পান করতে বসলে, ডান দিক থেকে পরিবেশন শুরু করব।

১৩. পরিবেশক সবার পরে পান করবে।

হাঁচি দেয়ার আদব

১. হাঁচি এলে মুখে হাত রাখব। মুখ থেকে হাত নামাব না।

২. হাঁচির পর পড়ব,

الحَمْدُ لله على كُلِّ حالٍ

আলহামদুলিল্লাহি আলা কুল্লি হাল

সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রশংসা।

৩. হাঁচি দেয়ার পর কাউকে আলহামদুলিল্লাহ বলতে শুনলে উত্তরে বলব,

يَرْحَمُكَ اللَّهُ

ইয়ারহামুকাল্লাহ

আল্লাহ তোমার প্রতি দয়া করুন।

তারপর হাঁচি দেওয়া ব্যক্তি বলবে,

يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ

ইয়াহদীকুমুল্লাহু ওয়া ইউসলিহু বালাকুম

আল্লাহ তোমাদের হেদায়াত দিন এবং তোমাদের অবস্থা ঠিক করে দিন।

৪. বারবার হাঁচি এলে তিনবারের পর হাঁচিদাতার জবাব না দিলেও কোনো সমস্যা নেই।

৫. অমুসলিম হাঁচি দিলে তার জবাবে কিছু বলার প্রয়োজন নেই।

হাই তোলার আদব

১. যতদূর সম্ভব হাই রোধ করার চেষ্টা করব।

২. হাই তোলার সময় কোনো ধরণের শব্দ করব না।

৩. হাই তোলার সময় বামহাত মুখের ওপর রাখব।

রাস্তার আদাব

১. পথ চলতে দৃষ্টি অবনত রাখব। হারাম দৃষ্টি থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করব।

২. যাদের সাথে দেখা হয় সালাম দিবো, কেউ সালাম দিলে জবাব দিব।

৩. কেউ ঠিকানা জানতে চাইলে, জানা থাকলে জানিয়ে দিবো। জানা না থাকলে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিব, অমি জানি না। ভুল ঠিকানা

দিয়ে কাউকে পেরেশান করব না।

৪. পথে কাউকে বিপদগ্রস্ত দেখলে সাধ্যমতো সাহায্য করার চেষ্টা করব।

৫. রাস্তায় কষ্টদায়ক বস্তু থাকলে সরিয়ে দিবো।

৬. ট্রাফিক আইন মেনে চলব। রাস্তার একপাশ দিয়ে চলব। যেখানে সেখানে গাড়ি পার্কিং করব না।

৭. রাস্তায় স্থাপন করা নির্দেশনাগুলো নষ্ট করব না, মুছে ফেলব না।

৮. রাস্তায় মলমূত্র ত্যাগ করব না। রাস্তায় ময়লা-আবর্জনা ফেলব না।

৯. নিজেদের গলি-মহল্লা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখব। যতটা সম্ভব পথিককে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকব।

১০. দুর্বল, বৃদ্ধ, অন্ধকে হাত ধরে রাস্তা পার করিয়ে দিব।

১১. নারীগণ যতটা সম্ভব রাস্তার কোল ঘেঁষে চলবেন। অপরিচিত পথচারী থেকে গা বাঁচিয়ে চলবেন।

১২. পথচলার সময় ছোটদের হাত ধরে রাখব।

১৩. গাড়িতে থাকলে পথচারীদের প্রতি লক্ষ্য রাখব। বিশেষ করে বৃষ্টির সময়, গাড়ির কারণে ময়লা পানি যেন ছিটকে পথচারির গায়ে না লাগে।

সফরের আদাব

১. সফরের আগে অভিজ্ঞ নির্ভরযোগ্য কারো সাথে পরামর্শ করে নিব।

২. সফরের উদ্দেশ্য ঠিক করে নিব।

৩. সফরে বের হওয়ার আগে লেনদেন পরিষ্কার করে নিব। ঋণ পরিশোধ করে দিব, না হয় ঋণদাতার সাথে কথা বলে বাড়তি সময় চেয়ে নিব। কেউ কিছু আমানত রাখলে তাদের সাথে কথা বলে যাবো। আমার ভরণপোষণে থাকা ব্যক্তিদের উপযুক্ত ব্যবস্থা করে যাবো।

৪. সফরে বের হওয়ার আগে তাওবা-ইস্তেগফার করে নিব।

৫. সফরে হালাল মাল থেকে ব্যয় করব।

৬. যেখানে যাচ্ছি, সেখানকার আবহাওয়া সম্পর্কে ভালো করে খোঁজখবর করে যাবো। সেখানকার আবহাওয়া অনুযায়ী প্রয়োজনীয় জামাকাপড় নিয়ে যাবো।

৭. সফরসংক্রান্ত জরুরি কাগজপত্র, জাতীয় পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট, বিমানের টিকেট, বোর্ডিং পাস, হোটেল বুকিংয়ের কাগজপত্র সাথে রাখব।

৮. দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজন হয়, এমন টুকিটাকি জিনিসপত্র সাথে নিব। ওষুধ, চশমা, মোবাইল, চার্জার, হেডফোন, কাগজকলম, বইপত্র, কারেন্সি মনে করে সাথে নিব।

৯. সফর শুরুর আগে গন্তব্যের দূরত্ব জেনে নিব, কতদিন থাকব, ঠিক করব। মুসাফিরের মাসালা সম্পর্কে জেনে নিব।

১০. কয়েকজন মিলে সফর করলে, তুলনামূলক অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে আমীর নির্ধারণ করব।

১১. সফরের শুরুতে ও শেষে দুই রাকাত নফল পড়ব।

১২. ওজু অবস্থায় সফর শুরু করার চেষ্টা করব।

১৩. ঘর থেকে বের হওয়ার সময় পড়ব,

بِسْمِ اللهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহি, ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

আল্লাহর নামে (ঘর থেকে বের হচ্ছি), আমি আল্লাহর ওপর ভরসা করলাম। আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোনো শক্তি ও সামর্থ্য নেই।

১৪. গাড়িতে আরোহণের সময় তিনবার আল্লাহু আকবার বলে এই দোয়া পড়ব,

لَنا هذا، وَما كُنّا له مُقْرِنِينَ، وإنّا إلى رَبّنا لَمُنْقَلِبُونَ، سُبْحانَ الذي سَخَّرَ

اللَّهُمَّ إنّا نَسْأَلُكَ في سَفَرِنا هذا البِرَّ والتَّقْوى، وَمِنَ العَمَلِ ما تَرْضى، اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنا سَفَرَنا هذا، واطْوِ عَنّا بُعْدَهُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصّاحِبُ في السَّفَرِ، والْخَلِيفَةُ في الأهْلِ، اللَّهُمَّ إنّي أَعُوذُ بكَ مِن وَعْثاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ المَنْظَرِ، وَسُوءِ المُنْقَلَبِ في المالِ والأهْلِ

সুবহা-নাল্লাযী সাখখারা লানা হাযা, ওয়ামা কুন্না লাহু মুক্বরিনীন, ওয়া ইন্না ইলা রব্বিনা লামুন ক্ব-লিবূন। আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্আলুকা ফী সাফারিনা হাযাল বিররা ওয়াত্তাক্বওয়া, ওয়া মিনাল আমালি মা তারযা, আল্লাহুম্মা হাওয়িন আলাইনা সাফারানা হাযা, ওয়াৎয়ি আন্না বু'দাহু, আল্লাহুম্মা আন্তাস্ সাহিবু ফিস্সাফারি, ওয়াল খলীফাতু ফিল আহলি। আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন ওয়া-সাইস্ সাফারি, ওয়া কাআ-বাতিল মানযারি, ওয়া সুইল মুনক্বালাবি ফিল মালি ওয়াল আহ্ল]

আমি পবিত্রতা ঘোষনা করি তাঁর যিনি, এগুলোকে আমাদের (ব্যবহারের) জন্য বশীভূত করে দিয়েছেন, অথচ আমরা এগুলোকে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না। আর আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের প্রতিপালকের দিকে ফিরে যেতে হবে। হে আল্লাহ! আমরা আমাদের এই সফরে আপনার নিকট সৎ কর্ম ও পাপমূক্ত জীবন কামনা করি এবং এমন কাজ-কর্ম কামনা করি যাতে তুমি সন্তুষ্ট হয়ে যাও। হে আল্লাহ! আমাদের জন্য এই সফরকে সহজ করে দাও এবং তার দূরত্ব সঙ্কুচিত করে দাও। হে আল্লাহ! তুমি সফরের সঙ্গী এবং পরিবারে স্থলাভিসিক্ত। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট সফরের কষ্ট হতে, খারাপ দৃশ্য দর্শন হতে এবং ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজনের অপ্রীতিকর অবস্থা থেকে আশ্রয় গ্রহণ করছি।

সফর থেকে ফিরে উপরোক্ত দোয়া পড়ার পর বলব,

آيِبُونَ تائِبُونَ عابِدُونَ، لِرَبِّنا حامِدُونَ.

আয়েবুনা, তায়েবুনা, আবিদুনা লিরাব্বিনা হামিদুন

আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন কারী, তাওবাকারী, ইবাদতকারী, আমাদের রবের প্রশংসাকারী।

১৫. সফরকালে সময়ের প্রতি যত্নবান থাকব।

১৬. বেশি কষ্ট না হলে, সময়ের স্বল্পতা না থাকলে, ফরজের পাশাপাশি সুন্নত-নফলও গুরুত্বের সাথে আদায় করব। তিলাওয়াত-জিকিরে মশগুল থাকব।

১৭. মেজবান ও সফরসঙ্গীদের সুবিধা-অসুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখব। তাদের কষ্টের কারণ হবো না। এমন কিছু করব না বা চাইব না, যা তাদেরকে বিব্রত করে।

১৮. সফরকালে নিজের শরীর-স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রাখব।

১৯. সফরকালে কোনো সমস্যা দেখা দিলে, ঠাণ্ডা মাথায় সমাধানের চেষ্টা করব। রাগক্রোধ দমনে রাখব। কেউ দুর্ব্যবহার করলে, অন্যায় আচরণ করলে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেতে দিব না।

২০. সফরকালে অন্যদের প্রতি খেয়াল রাখব। আমার কোনো কথা বা আচরণে যেন অন্যরা কষ্ট না পায়।

২১. যেখানে যাবো, সেখানকার অভিজ্ঞতা, অর্জিত তথ্যজ্ঞান, দর্শনীয় স্থান সম্পর্কে দুচার কলম লিখে রাখব।

২২. সফর থেকে ফেরার দিনক্ষণ বাড়িতে জানিয়ে রাখব।

২৩. সম্ভব হলে সফর থেকে ফেরার সময় ঘরের মানুষদের জন্য হাদিয়া নিয়ে আসব।

২৪. সফর থেকে ফিরে প্রথমে মহল্লার মসজিদে গিয়ে দুই রাকাত নামায পড়ে নিব। কিছু সময় মসজিদে অবস্থান করব। তারপর ঘরে যাবো। সহি-সালামতে ফিরে আসার জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করব।

২৫. বাড়ি ফেরার পর দেখা-সাক্ষাত শেষে সুস্থির হয়ে পুরো সফরের

হিসেব করব। সফরের উদ্দেশ্য হাসিল হয়েছে কি না। এই সফরের অভিজ্ঞতা পরবর্তী সফরে কাজে লাগাব।

গাড়িচালনার আদাব

১. গাড়িতে আরোহণকালে মাসনুন দোয়াগুলো পড়ে নিব।
২. নিজের কাছে যেমন গাড়িই থাকুক, আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করব। না শোকরি করব না।
৩. গাড়ি চালনাকালে কাউকে কষ্ট দিব না।
৪. ভুল জায়গায় গাড়ি থামাব না।
৫. গাড়িচালনাকালে ট্রাফিক আইন মেনে চলব।
৬. রাতের বেলা প্রয়োজনের অতিরিক্ত তীব্র হেডলাইট ব্যবহার করব না। মধ্যম আলোর হেডলাইট ব্যবহার করব।
৭. অকারণে হরণ বাজাব না।
৮. ড্রাইভিংকালে অন্য চালক ভুল করলে, এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব। সবর করব। আল্লাহ তাআলা প্রতিদান দিবেন।
৯. চলার পথে ঝগড়াবিবাদে জড়িয়ে পড়ব না। মুখ খারাপ করব না।
১০. অন্যকে রাস্তার হক দিব।
১১. নিজের গাড়ি, মোটর সাইকেলের নিয়মিত সার্ভিসিং করাব। গাড়ি নিয়ে রাস্তায় বের হওয়ার আগে যন্ত্রপাতি ঠিকমতো কাজ করছে কি না, যাচাই করে নিব।
১২. সফরে বের হওয়ার আগে জ্বালানি, টায়ার, ব্রেক, ইঞ্জিন, পানি ইত্যাদি পরীক্ষা করে নিব।
১৩. মোটর সাইকেল চালালে সবসময় হেলমেট ব্যবহার করব।
১৪. অন্য গাড়ি থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখব।
১৫. এ্যাম্বুল্যান্স ও ফায়ার সার্ভিসের গাড়িকে সাইড দিয়ে দিব।
১৬. গাড়ি চলাকালে সিটবেল্ট বেঁধে নিব। সহযাত্রীদেরকেও বেঁধে

নিতে বলব।

১৭. পথচারিদেরকে রাস্তা পার হওয়ার সুযোগ করে দিব।

১৯. ঝুঁকিপূর্ণ গতিতে গাড়ি চালাব না। মসজিদ, বাজার, আবাসিক এলাকা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পার্কের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় গতি কমিয়ে দিব।

২০. গাড়ি চলাকালে গান শোনা থেকে বিরত থাকব। গান শোনা কবিরা গুনাহ। এতে বরকত চলে যায়।

২১. সফর চলাকালে তিলাওয়াত, হামদ-নাত, বয়ান শোনা যেতে পারে।

২২. গাড়িতে থাকা ছোট বাচ্চাদের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। দরজায় চাইল্ড লকের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

২৩. ব্যস্ততম হাইওয়েতে চলার সময় বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করব।

২৪. মওসুম খারাপ থাকলে, বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করব।

২৫. পথচারী, সাইকেল, মোটর সাইকেল, ছোট গাড়ির চালকদের প্রতি বিশেষ নজর রাখব।

২৬. ছোটদেরকে গাড়ি চালানোর অনুমতি না দেয়া।

২৭. গাড়িতে ছোট হলেও অগ্নি নির্বাপক গ্যাস সিলিন্ডার রাখব।

২৮. গাড়ি চালনাকালে মোবাইল ব্যবহার থেকে বিরত থাকব।

২৯. গাড়িতে পানযোগ্য পানি রাখব। বিশেষ করে গরমকালে পথিক, শ্রমিক, সার্জেন্টকে পানির বোতল দেয়ার চেষ্টা করব।

৩০. অবস্থা ও পরিস্থিতি বুঝে, বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে লিফট দিতে পারি।

৩১. গাড়ির চালক নারী হলে, প্রয়োজনীয় পর্দা ও শরয়ী বিধানের প্রতি খেয়াল রাখব।

৩২. নারীদের জন্য ৭৭ কিমি বা তার চেয়ে বেশি দূরত্বে মাহরাম ছাড়া সফর জায়েজ নেই। হাদীসে পরিষ্কারভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

পানি ব্যবহারের আদাব

১. পানি আল্লাহর খাস নেয়ামত। একথা মনে রেখে ব্যবহারে যত্নবান থাকব।

২. পান করা বা ওজু-গোসলে প্রয়োজন পরিমাণ পানি ব্যবহার করব। বিনা প্রয়োজনে একফোঁটা পানিও খরচ করব না। পানির অপচয় করব না।

৩. কোথাও শুধু পান করার পানি রাখা থাকলে, হাতপা ধোয়া বা অন্য কাজে সে পানি ব্যবহার করব না। থালাবাসন, জামাকাপড় ইত্যাদি ধুবো না। হাঁ, অনুমতি থাকলে, অন্য কিছু করতে সমস্যা নেই।

৪. জনপরিসরে পানি ব্যবহারের সময় কিছু বিষয় খেয়াল রাখা জরুরি। পানির ট্যাপ খোলা রেখে চলে আসব না, প্রয়োজনের অতিরিক্ত সাবান ব্যবহার করব না। পানি পানের গ্লাস নিয়ে আসব না।

৫. পান বা ওজুর জন্য রক্ষিত পানি দিয়ে মোটর সাইকেল বা গাড়ি ধোবো না।

৬. মোটর ছেড়ে দিলে খেয়াল রাখব। সময়মতো মটর বন্ধ করে দিব। বেখেয়ালে হাউজ ভর্তি হয়ে পানি যেন বাইরে না পড়ে।

৭. ওজু-গোসলে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি ব্যবহার করব না।

৮. পানির মটর, পানি সংরক্ষণ বা ব্যবহারের উপকরণ নষ্ট হয়ে গেলে দ্রুত ঠিক করে ফেলব। পানি নিষ্কাষনের নালা, ড্রেন, পাইপ, হাউজ পরিষ্কার ও কর্মক্ষম রাখব। এ ব্যাপারে অলসতা করব না।

৯. ঘরের ব্যবহৃত পানি যেন মানুষ চলাচলের রাস্তায় গিয়ে না পড়ে। ব্যবহৃত পানি যাতে সরাসরি ড্রেনে গিয়ে পড়ে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করা। আমার পানি দ্বারা যেন পথচারীদের কষ্ট না হয়।

১০. পানি ব্যবহারটা পালাভিত্তিক হলে, নিজের পালার যতক্ষণ সময়, তার অতিরিক্ত সময় পানি আটকে রাখব না। অন্যের পালা যখন, তখন নিজে ব্যবহার করব না।

মুয়ামালাত

কেনাবেচার আদাব

১. হালাল রিযিকের অন্বেষণ করা অন্যতম ফরজ। এজন্য ব্যবসা-বাণিজ্যসংক্রান্ত মাসায়েল শিখব। তাহলে হারাম থেকে বাঁচা সহজ হবে।

২. ব্যবসাসংক্রান্ত জরুরি মাসায়েল জানা না থাকলে, বিজ্ঞ আলিমের পরামর্শ মোতাবেক ব্যবসা পরিচালনা করব।

৩. ব্যবসায় সততা, আমানতদারিতা বজায় রাখব। মিথ্যা, বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় নিব না।

৪. শরিয়তে হারাম ঘোষিত বস্তুর কেনাবেচা থেকে বিরত থাকব। সরকারীভাবে যেসব বস্তুর কেনাবেচা নিষিদ্ধ সেগুলোও পরিহার করব।

৫. প্রতিদিন সকাল-সকাল ব্যবসা শুরু করব। হাঁ, ব্যবসার ধরণই যদি এমন হয়, ক্রেতা দেরি করে আসে, তাহলে ঠিক আছে।

৬. মাপে কম দিব না। পরিমাপযন্ত্র নিখুঁত মাপ দেয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখব।

৭. ক্রেতার আস্থা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পণ্য বিক্রির জন্য মিথ্যা কসম খাবো না। এই বিক্রিতে বরকত থাকে না।

৮. পণ্যে কোনো দোষখুঁত থাকলে ক্রেতাকে সেটা জানিয়ে দেয়া কর্তব্য।

৯. বেচাকেনার যাবতীয় বিষয় লিখে রাখা উচিত। ধারকর্জ, বাকি লেনদেনের তথ্য লিখিতভাবে সংরক্ষিত থাকা উচিত।

১০. বাজারে অহেতুক হৈ চৈ, শোরগোল না করা।

১১. বেচাকেনার ফাঁকে ফাঁকে যিকির-তিলাওয়াত করার অভ্যাস গড়ে তোলা।

১২. দান-সদকা করতে অভ্যস্ত হওয়া। প্রতিদিনই কিছু না কিছু দান করা।

১৩. বেচাকেনায় ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়েই নিজের আচরণকে নরমকোমল রাখা। অপরপক্ষের দোষ ধরা পড়লে পারতপক্ষে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা।

১৪. পণ্যের গুণগত মান যথাযথভাবে ক্রেতার সামনে তুলে ধরা। বাড়িয়ে চড়িয়ে পণ্যের প্রশংসা না করা।

১৫. সমস্যায় পড়ে ক্রেতা পণ্য ফেরত দিতে এলে, নিয়ে নেয়া। এতে গুনাহ মাফ হয়। ব্যবসায় বরকত আসে। আল্লাহ তাআলার রহমত নাযিল হয়।

১৬. একজন কোনো পণ্য নিয়ে দরাদরি করলে, আমি তাতে নাক গলিয়ে মূল্য হাঁকাব না। তাদের কথাবার্তা শেষ হওয়ার পর আমি অগ্রসর হতে পারি।

১৭. বেচাকেনায় কখনোই ধোঁকা দিব না। এতে ব্যবসায় বরকত কমে যায়।

১৮. পণ্যে ভেজায় মেশাব না। বিশুদ্ধ পন্য বিক্রির চেষ্টা করব।

১৯. ক্রেতা নারী হলে তার সাথে শালীনতা বজায় রেখে কথা বলব। নজরের হেফাজত করব।

ঋণসংক্রান্ত আদাব

ঋণ দেয়ার আদাব

১. অভাবগ্রস্ত কেউ ঋণ চাইলে সামর্থ অনুযায়ী তাকে ঋণ দেয়ার চেষ্টা করব।

২. করজ দেয়ার সময় কথা টাকা দেয়া হচ্ছে, কখন ফেরত দিবে পুরো বিষয়টা সাক্ষীর উপস্থিতিতে লেখাপত্র করে রাখতে হবে।
৩. করজ দেয়ার সময় সওয়াব ও ইবাদতের নিয়ত করব। ঋণগ্রহিতার প্রতি অনুগ্রহ করছি, এমন চিন্তা মনে জায়গা দিব না।
৪. ঋণদাতার উচিত ঋণগ্রহীতার সাথে সুন্দর আচরণ করা। বিনাকারণে তাকে বিব্রত না করা। উত্তম ভঙ্গিতে ঋণ ফেরত চাওয়া।
৫. নির্দিষ্ট সময়ে ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে, বাড়তি সময় দেয়া। সম্ভব হলে করজ মাফ করে দেয়া।
৬. সুদের ওপর ঋণ দেয়া বা নেওয়া উভয়টাই সম্পূর্ণরূপে বর্জন করা।
৭. ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধ করতে এলে, তার জন্য এই বলে দোয়া করা,

أَوْفَيْتَنِي أَوفَى اللهُ بِكَ

আপনি আমার হক পুরোপুরি আদায় করেছেন, বিনিময়ে আল্লাহ তাআলাও আপনাকে পুরোপুরি হক দান করুন।

ঋণ গ্রহণের আদাব

১. পারতপক্ষে ঋণ গ্রহণ না করা উচিত। ঋণ গ্রহণ না করে উপায় না থাকলে, ঋণ গ্রহণ করা যেতে পারে।
২. নিজেকে বড় দেখানোর জন্য, অন্যকে ছোট দেখানোর জন্য, গুনাহের কাজের জন্য, শরিয়তবিরোধী উৎসব-আয়োজনের জন্য ঋণ গ্রহণ করা শরিয়তের দৃষ্টিতে নিন্দনীয়।
৩. প্রয়োজন পরিমাণ ঋণ গ্রহণ করা উচিত। বেশি না নেয়া।
৪. ফেরন দেয়ার নিয়তে ঋণ গ্রহণ করা উচিত। তাহলে আল্লাহ

তাআলা আদায় করাটা সহজ করে দিবেন।

৫. করজ নেয়ার সময় টাকার পরিমাণ, ফেরণ দেয়ার সময় ও স্থান লিখিতভাবে নথিভুক্ত করে রাখা উচিত। যাতে পরবর্তী সময়ে কোনো ধরণের ঝগড়া না হয়।

৬. নির্ধারিত সময়েই করজ আদায় করা উচিত। টাকা যোগাড় করতে না পারলে, ঋণদাতাকে নিজের অক্ষমতার কথা জানিয়ে দেয়া। কখন আদায় করা হবে, সম্ভাব্য তারিখ বলে দেয়া।

৭. টাকা থাকা সত্ত্বেও নির্ধারিত সময়ে ঋণ পরিশোধ না করা, অহেতুক টালবাহানা করা খুবই খারাপ কাজ।

৮. কোনো বস্তু ধার নিলে, ফেরত দেয়ার সময় হুবহু সেই বস্তু ফেরত দেয়া। ফেরত দেয়ার সময় সেই বস্তুর দাম কমবেশ হলেও যে পরিমাণ গ্রহণ করা হয়েছিল, সেটুকু ফেরত দেয়া।

৯. ঋণ পরিশোধের নির্ধারিত সময়ের আগেও ঋণদাতা ইচ্ছা করলে টাকাটা ফেরত চাইতে পারবে।

১০. ঋণ পরিশোধের জন্য টাকা যোগাড়ের পাশাপাশি আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করা উচিত। এই দোয়া পড়া যেতে পারে,

اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

আল্লাহুম্মাক্‌ফিনী বিহালালিকা ‘আন হারামিকা, ওয়া আগনিনী বিফাদলিকা ‘আম্মান সিওয়াক।

হে আল্লাহ! আপনার হালাল দ্বারা আমাকে যথেষ্ট করুন হারাম থেকে দূরে থাকার জন্য, আর আপনার অনুগ্রহ দ্বারা আমাকে স্বনির্ভর করুন যাতে আপনার ছাড়া কারো মুখাপেক্ষী না হতে হয়।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ، وَقَهْرِ الرِّجَالِ

আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযু বিকা মিনাল-হাম্মি ওয়াল-হাযান, ওয়া আউযু বিকা মিনাল-'আজজি ওয়াল-কাসাল, ওয়া আউযু বিকা মিনাল-জুবনি ওয়াল-বুখল, ওয়া আউযু বিকা মিন গালাবাতিদ-দাইনি, ওয়াকাহরির-রিজাল।

হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই দুশ্চিন্তা ও দুঃখ থেকে, অক্ষমতা ও আলস্য থেকে, ভীরুতা ও কৃপণতা থেকে, ঋণের বোঝা ও মানুষের জুলুম থেকে।

হাদিয়ার আদাব

হাদিয়া দেয়ার আদাব

১. হাদিয়া দেয়ানেয়ার মাধ্যমে পারস্পরিক মহব্বত বৃদ্ধি পায়। হাদিয়া দেয়ার সময় নিয়ত বিশুদ্ধ করে নেওয়া উচিত। হাদিয়া দেয়ার উদ্দেশ্য হবে আল্লাহকে রাজিখুশি করা। অন্যের প্রতি অনুগ্রহ ফলানো, লোকদেখানোর জন্য হাদিয়া দিব না।

২. পছন্দনীয় বস্তু হাদিয়া দেয়া উচিত।

৩. হাদিয়া দেয়ার ক্ষেত্রে নিকটাত্মীয়, অন্তরঙ্গ দোস্ত-আহবাবকে প্রাধান্য দেয়া উচিত। তারপর অন্যদেরকে দেয়া যেতে পারে।

৪. হাদিয়া হালাল সম্পদ দিয়ে কেনা উচিত। হারাম বা সন্দেহজনক টাকা দিয়ে হাদিয়া কেনা থেকে বিরত থাকা উচিত।

৫. হাদিয়া দেয়ার সময় হাদিয়াগ্রহীতার সুবিধা-অসুবিধার দিকে খেয়াল রাখা কর্তব্য। যেমন একজন মুসাফিরকে ভারী ও বড় আকৃতির কিছু হাদিয়া দিলে, সেটা বহন করে নিয়ে যাওয়া মুসাফিরের জন্য মুশকিল হয়ে যাবে।

৬. হাদিয়া দিয়ে খোঁটা দেয়া বা অনুগ্রহ ফলানো উচিত নয়। বরং হাদিয়া দেয়ার সময় এই মনোভাব পোষণ করা, হাদিয়া গ্রহণ করে আমাকে ধন্য করেছেন।

৭. অবস্থা ও চাহিদা বুঝে হাদিয়া দেয়া উচিত। যদি দেখা যায়, বস্তু না দিয়ে টাকা দিলে বেশি উপকার হবে, তাহলে তাই করা উচিত।
৮. হাদিয়া দেয়ার পর সেটা ফেরত চাওয়া উচিত নয়।

হাদিয়া গ্রহণের আদাব

১. কেউ হাদিয়া দিলে, হাদিয়া গ্রহণ করার পর কোনো কারণ ছাড়া হাদিয়া ফেরত দেয়া উচিত নয়। এতে দম্ভ-অহংকার প্রকাশ পায়।
২. সুগন্ধীজাতীয় কিছু হাদিয়া দিলে ফেরত না দিয়ে গ্রহণ করে ফেলা উচিত।
৩. হাদিয়া পাওয়ার জন্য খোশামোদ, তোষামোদ করা উচিত নয়। হাদিয়ার প্রতি নিরাসক্তি প্রকাশ করা উচিত।
৪. সামর্থ থাকলে হাদিয়ার বদলা দেয়া যেতে পারে। ধরা যাক, কেউ আমাকে একটা দামি কলম হাদিয়া দিল, আমিও বদলায় তাকে একটা কিতাব হাদিয়া দিতে পারি।
৫. হাদিয়া গ্রহণের বিনিময়ে হাদিয়াদাতাকে কোনো ধরণের অন্যায় সুযোগ দেয়া উচিত নয়। দীনের ক্ষেত্রে ছাড় দেয়া উচিত নয়।
৬. কারো কাছ থেকে হাদিয়া পাওয়ার আশায় বসে থাকা উচিত নয়। কেউ একবার হাদিয়া দিলে, পরের বার দেখা হলেও হাদিয়া পাবো, এমন আশা করা উচিত নয়।
৭. নিজের সন্তানকে হাদিয়া দিলে, ছেলে ও মেয়ের মধ্যে বৈষম্য করা উচিত নয়।
৮. হাদিয়াটা অল্পমূল্যের হলেও সেটা তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা উচিত নয়।

জিনিস ধার নেয়ার আদাব

প্রয়োজনীয় কোনো জিনিস অন্যের কাছ থেকে ধার হিসেবে আনাকে শরিয়তের পরিভাষায় আরিয়ত বলে।

১. নিজের কাছে প্রয়োজনীয় কোনো বস্তু না থাকলে, অনুমতিসাপেক্ষে অপরের জিনিস ব্যবহার করা যাবে। প্রয়োজনশেষে জিনিসটা দ্রুত ফিরিয়ে দিতে হবে। কাজ শেষ হওয়ার পরও জিনিসটা নিজের কাছে রেখে দিলে ভরসা নষ্ট হয়ে যাবে।
২. আরিয়ত হিসেবে আনা বস্তুটা যত্নের সাথে ব্যবহার করা উচিত। জিনিসটা আনার সময় যেমন ছিল, সে অবস্থায় ফেরত দেয়া উচিত।
৩. আমার কাছে থাকা কোনো জিনিস কেউ আরিয়ত হিসেবে চাইলে, কোনো কারণ ছাড়া দিতে অস্বীকার করা উচিত নয়।

বিয়েশাদির আদাব

১. বিয়ে করার সময় সুন্নাহর অনুসরণ, দৃষ্টি ও চিন্তার হেফাজতের নিয়ত করা উচিত।
২. পাত্রপাত্রী নির্বাচনে ঈমান, দীন, উত্তম চরিত্রকে প্রাধান্য দেয়া উচিত।
৩. বিয়েটা যেন ভালো জায়গায় হয়, এজন্য নিয়মিত দোয়া ও ইস্তেখারা করা উচিত।
৪. বিয়েশাদীর ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনো দিনকে অশুভ মনে করা উচিত নয়। বিয়ের জন্য যে কোনো দিনই বরকতময়।
৫. বিয়েশাদির ক্ষেত্রে দোয়া ও ইস্তেখারার পর অভিজ্ঞ দীনদার কারো সাথে পরামর্শ করে নেওয়া উচিত।
৬. বিয়ের প্রস্তাব পাঠানোর সময় নিজের কোনো কথা গোপন করা উচিত নয়। নিজের আর্থিক, আত্মিক, সামাজিক, পারিবারিক সব তথ্য জানিয়ে দেয়া উচিত।
৭. অন্য জায়গায় বিয়ের কথাবার্তা চলাকালে বিয়ের প্রস্তাব দেয়া উচিত নয়। ওখানে সম্বন্ধ ভেঙে গেলে প্রস্তাব দেয়া যেতে পারে।

৮. প্রস্তাব দেয়ার পর পাত্র বা পাত্রীপক্ষ বিয়ের সম্বন্ধ করতে আগ্রহ প্রকাশ করলে, আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করব।

৯. বিয়ের বাগদানপর্ব থেকে শুরু করে, বিয়ে সম্পন্ন হওয়া পযন্ত সব ধরনের শরিয়তবিরোধী রসম-রেওয়াজ পরিহার করা কর্তব্য।

১০. বিয়ের আয়োজন যতটা সম্ভব সাদাসিদা হওয়া উচিত। অযথা খরচ করা উচিত নয়।

১১. মোহরানার পরিমান এতবেশি হওয়া উচিত নয়, যা আদায় করতে স্বামী হিমশিম খেয়ে যায়। এত কমও হবে না, যা একটি মেয়ের জন্য অপমানজনক হয়ে যায়।

১২. বিয়েশাদীর আয়োজন প্রকাশ্যে হওয়া উচিত। গোপনে বিয়ে হলে অনেক সময় সমস্যা দেখা দেয়। এক্ষেত্রে মেয়েরা বৈষম্যের শিকার হয় বেশি।

১৩. বিয়ের আকদ সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার পর বরকনে উভয়ের জন্য দোয়া করব,

بَارَكَ اللهُ لَكُمَا وَبَارَكَ عَلَيْكُمَا وجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ

আল্লাহ তোমাদের দুজনের বিয়েতে বরকত দান করুন, আল্লাহ তোমাদের ওপর বরকত দায়েম কায়েম রাখুন, আল্লাহ তোমাদের দুজনের মধ্যে কল্যাণ ও নিরাপত্তার বন্ধন অটুট রাখুন।

১৪. যৌতুক চাওয়া ভয়ানক ঘৃণিত কাজ। মেয়ের বাড়ি থেকে সানন্দে কিছু দিলে, সেটার অতিরিক্ত কিছু চাওয়া মারাত্মক অপরাধ।

১৫. বরযাত্রীতে মাত্রাতিরিক্ত মানুষ নিয়ে যাওয়া উচিত নয়। পাত্রীপক্ষের ওপর চাপ পড়ে এমন কিছু করা মোটেও উচিত নয়।

১৬. মেয়ে বিদায়ের সময়, পাত্র বরণের সময় যেসব অনৈসলামিক রসম-রেওয়াজ আছে, সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা উচিত।

১৭. পাত্রের পক্ষ থেকে ওলিমা অনুষ্ঠান করা সুন্নত। যথাযথ গুরুত্বের সাথে এই সুন্নত আদায় করা উত্তম।

১৮. কেউ ওলিমার দাওয়াত দিলে, সমস্যা না থাকলে গ্রহণ করা উচিত।

১৯. বিয়ের প্রস্তাব শুধু ছেলেপক্ষ থেকেই নয়, প্রয়োজনে মেয়েপক্ষ থেকেও দেয়া যেতে পারে।

ওলিমার আদাব

১. নিজের সামর্থ অনুযায়ী ওলিমার আয়োজন করা উচিত।

২. সুন্নত আদায়ের উদ্দেশ্যে ওলিমার আয়োজন করা উচিত। লোকদেখানোর মানসিকতা পরিহার করা উচিত।

৩. ওলিমার আয়োজনে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতার মানসিকতা পরিহার করা উচিত। অমুক এতপদ রান্না করেছে, আমি তার চেয়ে এক বেশি পদ রাখব। এজন্য কেউ কেউ ঋণও করে। এসব পরিহার করা উচিত।

৪. ওলিমায় ধনী-গরিব নির্বিশেষে দাওয়াত দেয়া উচিত। উপহারের আশায় বেছে বেছে শুধু বিত্তশালীকে দাওয়াত দেয়া উচিত নয়।

৫. ওলিমার অনুষ্ঠানে এমন কিছু কাজ করা উচিত, যা আল্লাহর রহমত টেনে আনে। এজন্য বৃদ্ধ, অসহায়, এতিমদেরও ওলিমায় শরিক করা যেতে পারে। আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন, এমন কাজ সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা কর্তব্য।

৬. ওলিমায় গানবাদ্যির আয়োজন সম্পূর্ণরূপে বর্জনীয়।

৭. নারী ও পুরুষের জন্য আলাদা ব্যবস্থা করা দরকার। বেপর্দা থেকে বাঁচা দরকার।

৮. ওলিমার খানা সম্পূর্ণ বিনিময়মুক্ত হওয়া উচিত।

৯. কেউ আগ্রহ করে বরকনেকে হাদিয়া দিলে গ্রহণ করা যেতে পারে। উপহার গ্রহণের জন্য আলাদা করে ব্যবস্থা করা, উপহার না আনলে ঢুকতে না দেয়া, এসব পরিহার করা দরকার।

চাকরি সংক্রান্ত আদাব

চাকরি দেয়ার আদাব

১. ঈমানদার, পরহেযগার, নামাজী কর্মক্ষম ব্যক্তিকে চাকরি দেয়া উচিত।

২. চাকরি দেয়ার আগে তার দায়িত্বকর্তব্য কী, তাকে কী করতে হবে, কতক্ষণ কাজ করতে হবে, এজন্য মাসে কত পাবে সব পরিষ্কার করে নেয়া উচিত।

৩. কর্মচারীকে ইনসাফসম্মত ও গ্রহণযোগ্য মাসোহারা, কাজের উপযুক্ত পরিবেশ দেয়া উচিত।

৪. পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যসম্মত কর্মক্ষেত্রের ব্যবস্থা করা উচিত।

৫. কর্মচারির যোগ্যতার যথাযথ স্বীকৃতি ও মূল্যায়ন করা উচিত। নতুন দক্ষতা বৃদ্ধির প্রতি উৎসাহ দেয়া উচিত।

৬. কর্মচারীদের অভাব-অভিযোগ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা উচিত। তারা কোনো সমস্যা তুলে ধরলে, অতি দ্রুত তা দূর করা উচিত।

৭. কর্মচারীদের সাথে সুন্দর, বন্ধুত্বপূর্ণ, আন্তরিক আচরণ করা উচিত।

৮. মাসশেষে সময়মতো মাসোহারা দিয়ে দেয়া উচিত। কারণ ছাড়া বিলম্ব করা উচিত নয়।

চাকরি করার আদাব

১. সময়মতো কর্মস্থলে হাজির হয়ে যাওয়া উচিত।

২. কাজের সময় পুরো মনোযোগ কাজের প্রতি নিবদ্ধ রাখা আবশ্যক। কাজের সময় নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকা উচিত নয়।

৩. চাকরিতে ঢোকার আগে যাচাই করে নেয়া উচিত, যা করতে হবে, সেটা শরিয়তসম্মত কি না। শরিয়তবিরোধী কোনো কাজে জড়ানো উচিত নয়। রিজিকের মালিক আল্লাহ।
৪. উর্ধনত কর্মকর্তার সাথে সম্মানপূর্ণ আচরণ করা উচিত। সহকর্মীদের সাথে হৃদ্যতাপূর্ণ আচরণ করা উচিত।
৫. নিজের অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতা সহকর্মীদের মাঝে বিলিয়ে দেয়া উচিত। নিজের মধ্যে কুক্ষিগত করা উচিত নয়। তারা কোনো সহযোগিতা চাইলে, সানন্দে এগিয়ে যাওয়া উচিত।
৬. দিনদিন নিজের যোগ্যতা বৃদ্ধির প্রতি যত্নবান থাকা উচিত। নিজেকে কর্মক্ষেত্রে অপরিহায করে তোলা জরুরি।
৭. নিজের কর্তব্য প্রতিদিন পুরোপুরে আদায় করা উচিত। কোনো রকমের ফাঁকি বা অলসতা করা উচিত নয়।
৮. কর্মক্ষেত্রে পুরোপুরি আমানতদারিতার সাথে কাজ করা উচিত।

কসম খাওয়ার আদাব

১. প্রয়োজন ছাড়া কসম খাবো না। বাধ্য হলে আল্লাহর নামে কসম খাওয়া যেতে পারে। আল্লাহর সত্তা, নাম বা সিফাত ছাড়া অন্য কিছুর মাধ্যমে কসম খাওয়া হারাম।
২. কোনো অবস্থাতেই মিথ্যা কসম খাওয়া উচিত নয়।
৩. হারাম বস্তু, গুনাহের কাজের জন্য কসম খাওয়া উচিত নয়। ভুলে করে ফেললে সাথে সাথে কসম ভেঙে ফেলতে হবে।
৪. কোনো বিষয়ে কসম খেলে, সেটা পুরো করা আবশ্যক।
৫. কসম ভেঙে ফেললে তার কাফফারা দেয়া আবশ্যক।

ওয়াদার আদাব

১. ওয়াদা করতে হলে, স্পষ্ট শব্দে ওয়াদা করা জরুরি। ওয়াদায় কোনো ধরণের অস্পষ্টতা থাকা উচিত নয়।
২. কারো সাথে ওয়াদা করলে, সেটা পূরণ করা আবশ্যক।
৩. সময়মতো, চাহিদামতো ওয়াদা পূরণে সচেষ্ট থাকা উচিত।
৪. কোনো কারণবশত ওয়াদা পূরণ করতে না পারলে, আগেই জানিয়ে দেয়া উচিত। নিজের সমস্যা ও অপারগতার কথা জানিয়ে দেয়া উচিত।

ওসিয়তের আদাব
১. ওসিয়ত করার আগে আল্লাহর সাহায্য ও সন্তুষ্টি কামনা করা উচিত। যাতে কোনো ধরণের ভুল না হয়, কারো প্রতি জুলুম না হয়।
২. ওসিয়তের ক্ষেত্রে ইনসাফ বজায় রাখা জরুরি। কারো প্রতি যেন জুলুম না হয়।
৩. ওসিয়তকালে নিজের ওয়ারিশের প্রয়োজনের কথা খেয়াল রাখা উচিত। তাদের স্বার্থ বজায় রাখা উচিত। তাদের আর্থিক অবস্থা বিবেচনায় রাখা জরুরি।
৪. ওসিয়তের মধ্যে ওয়ারিশকে তাকওয়ার উপদেশ দেয়া উচিত। নিজেদের মধ্যে ঐক্য ধরে রাখা, হকপথে চলার প্রতি তাকিদ দেয়া উচিত।
৫. ফরজ ইবাদত বাকি থেকে গেলে সেগুলো আদায় করে দেয়ার ওসিয়ত করা উচিত। যেমন বদলি হজ করানো, আনাদায়ী যাকাত আদায়, কসমের কাফফারা, রোজা ও নামাজে ফিদয়া ইত্যাদি আদায় করার কথা বলে যাওয়া জরুরি।
৬. ঋণ থাকলে সেটা পরিশোধ করার কথা ওসিয়তে বলা জরুরি।

৭. আল্লাহর রাস্তায় দান-খয়রাত করার কথাও ওসিয়তে থাকা জরুরি।
৮. ওসিয়ত লেখা হয়ে গেলে সেটা যত্নের সাথে সংরক্ষণ করা জরুরি। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে ওসিয়তের কথা জানিয়ে দেয়া উচিত। যাতে সময়মতো আমল করতে পারে।
৯. ওসিয়তনামায় নিজের সাক্ষর ও সাক্ষীর সাক্ষর থাকা জরুরি।
১০. ওসিয়তনামায় শুধু হালাল ও শরিয়তসম্মত বিষয়ই স্থান দেয়া উচিত। শরিয়তবিরোধী কোনো চাহিদা-আবদার থাকা উচিত নয়।
১১. দান-সদকার ওসিয়ত করলে, সম্পদের এক তৃতীয়াংশের ভেতরে করা উচিত। পরিমাণ এর চেয়ে বেশি হলে ওসিয়ত কাযকর হবে না।
১২. লিখিত ওসিয়ত রদবদল করা যাবে, বাতিল করা যাবে। মৃত্যুর পর অন্য কারো ওসিয়ত বদলের ক্ষমতা নেই। হাঁ, ওসিয়তনামায় শরিয়তবিরোধী কিছু থাকলে, সেটা পরিহার করতে হবে।

আলহামদুলিল্লাহ
ওয়াফফাকানাল্লাহ
জাযাকুমুল্লাহু খাইরান

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম

রাদিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া রাদূ আনহু